ক্রুসেড-১৮
বিভ্রান্ত ছোবল
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ১৮

বিষাক্ত ছোবল

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭[illegible] ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ১৮ # গাদ্দার

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৫

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৩

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস্‌

মূল্যঃ [illegible] ৫০.০০

CRUSADE-18

BISHAKTO SUBOL

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

Published on: June 2003

PRICE : 3[illegible]0.00

ISBN 984-581-254-6

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভণ্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ যাযাবর কন্যা ▼ মহাসমর

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই
আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন
সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ
▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

আন নাসের ও তার সাথীরা মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে প্রখর সূর্যতাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। মরুভূমির সেই জাহান্নাম থেকে তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো দুই নারী। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, এটা মরুভূমির তামাশা, এই দুর্গম প্রান্তরে মেয়ে আসবে কোত্থেকে? পরে মেয়েরা যখন ওদের পানি ও খাবার দিয়ে জীবন্ত করে তুললো, তখন ওরা ভাবলো, এরা মেয়ে নয়, জ্বীন বা পরী হবে।

ছোটবেলা থেকে জ্বীন-পরীদের গল্প শুনতে শুনতে জ্বীন ও পরীর ভয় আন নাসেরের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। যদিও জীবনে কোনদিন জ্বীনপরী দেখেনি, তবু গল্প শুনতে শুনতে কল্পনায় তাদের যে ছবি খোদাই করা ছিল, এ মেয়েদের দেখে সে কল্পনা যেন বাস্তব হয়ে ধরা দিল। মরুভূমির জাহান্নামে দুই অনিন্দ্যসুন্দর মেয়েকে দেখে সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, এরাই সে কল্পনার জ্বীন।

মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে সে তার সাথীদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত জ্বীনের খপ্পরে এসে পড়লো? ভাবনাটা মনে আসতেই এক অজানা ভয় ও শিহরণ ঘিরে ধরলো তাকে।

সেই মেয়েরা পানির সাথে বিশেষ ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য

মিশিয়ে সম্মোহিত করে ওদেরকে এনে তুললো এক দুর্গে। দুর্গে আসার পর এক সময় তাদের নেশার ঘোর কেটে গেল। আন নাসেরের কাছে এগিয়ে এলো এক মেয়ে। তার প্রশ্নের জবাবে বললো, 'আমরা জ্বীন-পরী কিছু নই, তোমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ।'

আন নাসের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তার অভিজ্ঞ চোখ বললো, এটা একটা দুর্গ। জ্বীন-পরীদের এমন দুর্গের প্রয়োজন হয় না। মেয়েটি তাহলে সত্যি কথাই বলেছে! এরা জ্বীন-পরী কিছু নয়! তাহলে কি ওরা মেয়েদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেরাই পায়ে হেঁটে এসে ঢুকে পড়েছে দুশমনের দুর্গে? এতক্ষণে আন নাসের বুঝতে পারলো, সে এবং তার সাথীরা কি ভয়ংকর জালে আটকা পড়েছে।

কি করে এ জাল কেটে বেরিয়ে যাওয়া যায় এ নিয়েই ভাবছিল আন নাসের। তার সাথীরা তখনও ঘুমিয়ে, মেয়েটি আবার ফিরে এলো। বললো, 'তুমি জানতে চাচ্ছিলে তোমরা এখন কোথায় এবং কেন তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি? কেন এনেছি এ প্রশ্নের জবাব এখন দেয়া সম্ভব নয়, তবে তোমরা এখন কোথায় তা বলে দিতে পারি।'

আন নাসের উদগ্রীব হয়ে বললো, 'কোথায়?'

'এটা একটা কেল্লা।'

'এটা যে কেল্লা তা তুমি না বললেও জানি। কিন্তু কেল্লাটি কোথায় অবস্থিত, কি এর নাম, এখানে কারা থাকে?'

'এ কেল্লার নাম আছিয়াত। এটা ফেদাইনদের কেল্লা। এখানে

ফেদাইন নেতা শেখ মান্নান বাস করেন। ফেদাইনদের সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'হ্যাঁ জানি!' আন নাসের উত্তর দিল, 'খুব ভাল করেই জানি। আর এখন এটাও জানতে পারলাম, তুমি আসলে কে? আমি শুনেছিলাম, ফেদাইনদের দলে সুন্দরী মেয়েরাও কাজ করে। তুমি তাহলে সেই সুন্দরীদের একজন?'

'আমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।' মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমার নাম লিজা!'

'তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলে তোমরা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছো কেন? তোমার সাথে তো আরও একটি মেয়ে ছিল, সে কোথায়?'

'হ্যাঁ! আমার সাথে অন্য যে মেয়েটি ছিল তার নাম কারিশমা। সেও এখানেই আছে।' লিজা বললো, 'কেন তোমাদের এখানে এনেছি, সে কথা বলা যাবে না। তবে কেমন করে এনেছি, সেটা বলতে পারি। তোমাদেরকে নেশা খাইয়ে সম্মোহিত করে এখানে এনেছি।'

সে এই পর্যন্ত বলে শেষ করেছে, এমন সময় কামরার দরোজায় এসে দাঁড়ালো কারিশমা। কারিশমা চোখের ইশারায় লিজাকে বাইরে ডাকলো, লিজা বাইরে চলে গেল। আন নাসের খাটে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

তার কাছে এখন অনেক কিছুই পরিষ্কার। মরুভূমির মহা বিস্তারে হারিয়ে যাওয়ার পর যে মেয়েরা তাদের পানি ও খাবার দিয়েছিল, ওরা আসলে জ্বীন নয়, মানুষ। ওরা তাদেরকে

নেশাগ্রস্ত করে নিয়ে এসেছে চরম এক সন্ত্রাসী গ্রুপ ফেদাইনদের কেল্লায়। ফেদাইনরা বেশ সুসংগঠিত এবং তাদের সংগঠন আরবের সব কয়টি দেশে বিস্তৃত। ওদের মূল পরিচয় ওরা প্রফেশনাল গুপ্তঘাতক। পয়সার বিনিময়ে ওরা যে কাউকে যে কোন সুরক্ষিত স্থানেও অবলীলায় খুন করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে। কে বা কারা লোকটির হত্যাকারী সে হদিস কেউ কোনদিন বের করতে পারে না। এ ধরনের ভয়ংকর খুনীদের আস্তানা বা কেল্লা থেকে বের হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

'এখানে কি করছো?' কারিশমা জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটির সাথে এমন ঘনিষ্ট হয়ে বসার সময় তোমার কি একবারও মনে হয়নি, মুসলমানরা ঘৃণার পাত্র! তুমি কি শেষে গাদ্দারী করবে নাকি?'

লিজার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। চেহারা ভাবলেশহীন, নির্বিকার। মুখে কোন কথা নেই। একদিন আবেগের বশে এবং অন্যের প্ররোচনায় পড়ে মুসলমান নেতাদের চরিত্র হননের যে পেশা গ্রহণ করেছিল, এখন সে কথা মনে হতেই নিজের প্রতি ঘৃণা জন্মাল।

দিনে দিনে এই জঘন্য পেশার প্রতি তার ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো, নিজেকে এই পেশা থেকে সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলো সে। কিন্তু যখন মনে হলো, এ পথে আসা যায়, কিন্তু যাওয়া যায় না, তখন ঘৃণা রূপ নিল প্রতিশোধ স্পৃহায়। কিভাবে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবে, কোন কূল না পেয়ে সে এই

পরিবেশ থেকে পালানোর পথ খুঁজতে লাগলো। এ সময়ই ওদের হাতে এসে পড়ে আন নাসেররা।

'আমিও যুবতী মেয়ে!' কারিশমা তাকে বললো, 'আন নাসেরের মত সুদর্শন যুবক যে কোন যুবতীর হৃদয় দখল করতে পারে। তাকে আমারও ভাল লাগে। সত্যি বলছি, এমন আকর্ষণীয় যুবককে ভাল না বেসে পারা যায় না। যদি তুমি বলো, তাকে তুমি ভালবেসে ফেলেছো, তাতে আমি আশ্চর্য হবো না। আমি বুঝতে পারছি, বুড়ো মুসলিম আমীর ও সেনাপতিদের বিরুদ্ধে তোমার মনে ঘৃণা জমে উঠেছে। কিন্তু তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে করো, স্মরণ করো তোমার শপথের কথা, এই মুসলমানরা তোমার শত্রু। এদের অনিষ্ট করার শপথ নিয়েছো তুমি।'

'না! তা নয় কারিশমা!' লিজা অধীর হয়ে বললো, 'আমার সঙ্গে তার তেমন কোন ভাব হয়নি, যে জন্য তুমি আমাকে তিরস্কার করতে পারো।'

'তবে তার কাছে কেন এসেছো, কেন তার সাথে ঘনিষ্টভাবে মিশছো?'

'আমি এখন সে বর্ণনা দিতে পারবো না।' লিজা বিরক্ত কণ্ঠে বললো, 'জানি না আমার মাথায় হঠাৎ এমন খেয়াল কেন এলো, কেন তার পাশে গিয়ে বসতে ইচ্ছে জাগলো মনে।'

'তার সাথে কি কি কথা হয়েছে তোমার?'

'তেমন কোন বিশেষ কথা হয়নি।' লিজা বললো।

'তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে খুব অবহেলা করছো।' কারিশমা

বিরক্তি প্রকাশ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, 'এটা বিশ্বাসঘাতকতা। তুমি জানো বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি?'

'জানি। মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু কারিশমা, তুমি শুনে রাখো!' লিজা বললো, 'আমি ঐ বুড়োর খায়েশের খেলনা হবো না। ফেদাইনদের নেতা বলে শেখ মান্নান তোমার কাছে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, আমার কাছে সে একজন খুনী ও সন্ত্রাসী মাত্র। যদি সে আমার ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তবে আমি তাকে খুন করবো। নয়তো নিজেই শেষ হয়ে যাবো।'

কারিশমা এ কথা শুনে একদম পাথর হয়ে গেল। আসলে সে উজ্জ্বল পাথরই ছিল, যার রং ও উজ্জ্বলতা সবাইকে আকৃষ্ট করে। সবাই তাকে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু পাথরের তো কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। কিন্তু লিজা ততদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি। নারীর সহজাত কামনা-বাসনা, ভাললাগা-ভালবাসা থেকে এখনো নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি।

কারিশমা তাকে বললো, 'আমি কল্পনাও করতে পারিনি, তুমি এত বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবে। বুঝলে তোমাকে আমি এখানে আনতাম না।'

'আমি কি তোমার পায়ে পড়েছিলাম যে, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো!' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বললো লিজা।

রাগ করলো না কারিশমা। বললো, 'এ কেল্লাটাই সবচে কাছে ছিল, তাই প্রথম মঞ্জিল হিসাবে এখানে এসেছি। নয়তো এক টানে ত্রিপলী পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। তা

ছাড়া আমাদের মত দুই নারীর পক্ষে চারজন কমাণ্ডোকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সামাল দেয়ার ঝুঁকিও আমি নিতে চাচ্ছিলাম না।'

'কিন্তু আমাকে এক হিংস্র পশুর হাতে তুলে দেয়ার ঝুঁকি তো ঠিকই নিতে পারলে।' লিজার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ। কারিশমা দরদভরা কণ্ঠে বললো, 'তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি, শেখ মান্নানের কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো।'

'তাহলে এখান থেকে জলদি পালিয়ে যাওয়ার একটা উপায় বের করো।'

'সে চেষ্টা আমি করছি, কিন্তু মহাপ্রভুর দোহাই, তুমি আমাকে কথা দাও, বন্দীদের সাথে তুমি আর কোন রকম দহরম মহরম করবে না।'

'সত্যি কথা বলবো কারিশমা!' লিজা বললো, 'আমি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই কমাণ্ডোদের সাহায্য নেবো। কারণ শেখ মান্নানের সাথে আমি যে ব্যবহার করেছি, তাতে আমি নিশ্চিত, সে আমাদের এখান থেকে বেরোতে দেবে না। না তুমি নিজে বের হতে পারবে, না আমাকে বের করতে পারবে। কিন্তু এরা দক্ষ কমাণ্ডো, এদের বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর গল্প-কাহিনী লোক মুখে প্রচলিত। এদের সামান্য সুযোগ দিলেই এরা পালিয়ে যেতে পারবে। চাই কি সে সহযোগিতার বিনিময়ে তোমাকে-আমাকেও সঙ্গে নিতে রাজি হবে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

'আমি এদের বীরত্ব ও সাহসের প্রশংসা করি। স্বীকার করি এরা কুশলীও। তোমার কথাই ঠিক, সুযোগ পেলে ওরা পালিয়ে

যেতে পারবে।' কারিশমা বললো, 'কিন্তু তুমি কি চিন্তা করে দেখেছো, এরা আমাদের দু'জনকে বের করে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? তুমি কি মনে করো তারা আমাদেরকে আমাদের ঠিকানায় পৌছে দেবে? নিশ্চয়ই তারা তা করবে না, তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আমার কথা শোনো! মিথ্যা আশ্রয় খুঁজতে চেষ্টা করো না।'

কারিশমা থামলো। লিজাও চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। কারিশমার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে লিজা। এক সময় কারিশমাই পুনরায় মুখ খুললো। বললো, 'গোছল করে পোশাক পাল্টে নাও। আজ রাতে শেখ মান্নানের খাস কামরায় খাওয়ার দাওয়াত রয়েছে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তার সাথে তোমার ব্যবহার ও আদব-কায়দা কেমন হবে। তুমি তাকে অপছন্দ করো এমন মনোভাব যেন তার সামনে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না পায়। এটাও যেন প্রকাশ না পায়, তুমি তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি এইমাত্র খবর পেলাম, হারানের গভর্ণর গুমাস্তগীন এখানে এসেছেন।

তুমি তো ভাল করেই জানো, গুমাস্তগীন সুলতান আইয়ুবীর ঘোরতর দুশমন। ফলে তাকেও আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট বন্ধু মনে করি। আমরা খুব কষ্ট করে এই মুসলমান শাসকদের হাত করেছি, তাদেরকে বন্ধু বানিয়েছি। এরা সবাই আমাদের অগ্রযাত্রার একমাত্র প্রতিবন্ধক সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়ছে। ফলে এমন কোন আচরণ করো না, যাতে তারা

অসন্তুষ্ট হতে পারে।'

৩

কারিশমার ডাকে লিজা বেরিয়ে যেতেই আন নাসের গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। এরা যে জ্বীন-পরী কিছু নয়, আসলেই রক্ত মাংসের মানুষ, এ কথাটা বুঝতে এতো দেরী হলো কেন, তাই ভেবে আফসোস হলো তার।

এদিকে লিজার আচরণও তাকে অধীর করে তুললো। লিজা বলেছে, নেশাগ্রস্ত করে তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। আন নাসের অনুভব করলো, তার এ কথায় সত্যতা আছে। কারণ মরুভূমির সব কথাই তার মনে আছে, কিন্তু ওদের সাথে সাক্ষাতের পর থেকে যা ঘটেছে তার সব স্মৃতি স্পষ্ট নয়। যদি তাই হয় তাহলে ওরা তার দুশমন। কিন্তু দুশমন হলে মেয়েটি তার প্রতি সদয় হবে কেন?

অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলো না আন নাসের। লিজা তাকে আরও বলেছে, আন নাসের ও তার সাথীরা এখন ফেদাইন গ্রুপের হাতে। অথচ মেয়েটি নিজে ফেদাইন নয়, তাহলে সে কে? ফেদাইন না হয়েও কেন তবে তারা ফেদাইনদের আস্তানায় এসে উঠেছে?

সে ভাবলো, অস্বীকার করলেও এই মেয়ে দু'টি কি ফেদাইন দলেরই কর্মী হতে পারে না? কারণ ফেদাইনরাই মেয়ে ও নেশা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করে। ফেদাইনদের হাতে আছে হরেক রকম নেশা জাতীয় দ্রব্য। এত বিচিত্র

নেশার দ্রব্য আর কারো কাছে নেই। কমাণ্ডো ট্রেনিংয়ের সময় ফেদাইনদের নেশা জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে এবং এই নেশা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে বিশেষ ভাবে সাবধানও করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি লাভ হলো সেই সাবধান বাণীতে? এই সুন্দরী মেয়েরা তো সেই নেশার অস্ত্র দিয়েই তাদের ঘায়েল করে এখানে নিয়ে এসেছে!

সে তার সঙ্গীদেরকে জাগালো। তারাও জেগে উঠে দুর্গের এক কামরায় নিজেদের আবিষ্কার করে আন নাসেরের মতই বিস্মিত হলো। বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে ওরা আন নাসেরের মুখের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

'বন্ধুগণ!' আন নাসের তাদের বললো, 'আমরা ফেদাইনদের জালে আটকা পড়ে গেছি। এই কেল্লার নাম আছিয়াত কেল্লা। এটা ফেদাইনদের হেডকোয়ার্টার। ফেদাইন নেতা শেখ মান্নানও এখানেই থাকেন।

যে মেয়ে দু'টি আমাদের ধরে এনেছে তারা জ্বীন-পরী কিছু নয়, আমাদের মতই মানুষ। আমি এখনও বলতে পারছি না, এরা আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবে। তবে আমরা সাবধান ও সতর্ক না হলে আমাদের পরিণতি হবে ভয়ংকর।'

আন নাসের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আরো বললো, 'তোমরা সবাই জানো, ফেদাইনরা গুপ্তঘাতক। এ জন্য তারা সম্মোহনসহ নানা রকম বিদ্যা প্রয়োগ করে থাকে। তাদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। যদি আমরা কখনো এই কামরা থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাই, তবে আমাদের

প্রথম কাজ হবে এ কেল্লা থেকে পালানোর কৌশল বের করা। আপাতত তোমরা এ নিয়ে কোন কথা বলবে না, সবাই নীরব থাকবে। যদি এরা কিছু জিজ্ঞেস করে তবে সংক্ষেপে উত্তর দেবে। মনে রেখো, এই শয়তানদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।'

'এরা কি আমাদের কারাগারে পাঠাবে?' আন নাসেরের এক সাথী প্রশ্ন করলো।

'যদি কারাগারে পাঠায় তবে আমাদের খুশী হওয়ারই কথা।' আন নাসের বললো, 'কিন্তু এরা আমাদের মন-মগজে নতুন চিন্তা ঢুকাতে চায়। হাশিশ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি গুলিয়ে দিতে চায়। সুন্দরী মেয়ে দিয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনায় ভোগের স্পৃহা জাগাতে চায়। ভুলিয়ে দিতে চায় আমাদের ধর্ম ও ঈমান।'

'পালানো ছাড়া আমাদের মুক্তির আর কোন পথ নেই।' আন নাসেরের এক সাথী বললো।

'পালাতে না পারলে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো, কিন্তু ঈমান হারাতে পারবো না।' অন্য একজন বললো।

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে।' আন নাসের বললো, 'ওদেরকে আর নেশা খাওয়ানোর সুযোগ দেয়া যাবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে পালানো, লড়াই অথবা মৃত্যু- এর যে কোন একটা বেছে নেবো আমরা, কিন্তু কিছুতেই তাদের মুঠোর ভিতর ঢুকবো না।'

সারাদিন কেটে গেল। উল্লেখযোগ্য তেমন আর কিছু ঘটলো না

সারাদিন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে গেল সূর্য।
সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসতেই এক লোক কামরার মধ্যে বাতি দিয়ে গেল। সে কারো সঙ্গে কোন কথা বললো না। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল তাদের। সারাদিন তাদের কিছুই খেতে দেয়নি। তারা ভেবেছিল, বাতি যখন দিয়েছে, খাবারও পাঠাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হলো না। বাইরে থেকে সেই যে কামরা বন্ধ করে চলে গেলো লোকটি, তারপর থেকে আর কোন লোকের দেখা নেই।
একটু দূরে কেল্লার মধ্যে শেখ মান্নানের মহল সাজানো হয়েছে। গুমাস্তগীনের সম্মানে বাড়তি আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওরা কামরার মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছিল নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কলকাকলি। সেখানে উৎসব চলছিল। সমবেত অফিসারদের মধ্যে পরিবেশন করা হচ্ছিল খাবার ও মদ। উৎসব হলের পাশেই শেখ মান্নানের খাস কামরা। ওখানেও খাবার পরিবেশন করা হলো। দামী মদের বোতল সাজিয়ে রাখা হলো টেবিলে। বিভিন্ন ধরনের খাবারের সুগন্ধে কামরার পরিবেশ মাতোয়ারা।
আহার্য সামগ্রী সামনে নিয়ে বসে আছে শেখ মান্নান। তার ডাইনে কারিশমা ও বামে লিজা। সামনে গুমাস্তগীন। শেখ মান্নান গুমাস্তগীনকে বললো, 'নিন, খাওয়া শুরু করুন।'
ওরা খাওয়া শুরু করলো। চার কমাণ্ডো তাদের কামরায় বসে সুস্বাদু খাবারের সুবাস পাচ্ছিল। এতে তাদের ক্ষুধা আরো বেড়ে

গেল।

হারান দুর্গের অধিপতি গুমাস্তগীন সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর ওফাতের পর নিজেকে স্বাধীন শাসক রূপে ঘোষণা করে আশপাশের অঞ্চল নিয়ে একটি রাজ্য গঠন করেছিল। সেই সুবাদে সে বিশেষ সম্মানিত মেহমান ছিল শেখ মান্নানের।

খেতে খেতে গুমাস্তগীন শেখ মান্নানকে বললো, 'তুমি জানো সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আল মালেকুস সালেহ ও সাইফুদ্দিনের যে সম্মিলিত বাহিনী তুর্কমান অভিমুখে যাত্রা করেছিল, সে বাহিনীতে আমার সৈন্যও শামিল ছিল। এই সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। আমি নিজে আমার সৈন্যদের সাথে ময়দানে যেতে পারিনি। সাইফুদ্দিন বললো, সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ড একক হাতে না থাকলে যুদ্ধে বিশৃংখলা দেখা দেবে, তাই আমি যাইনি। ভেবেছিলাম সাইফুদ্দিন এ যুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দিতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল তো জানো। এ যুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বড়ই আফসোসের কথা। এমনটি আমরা আশা করিনি। যুদ্ধের কমাণ্ড আপনার হাতে থাকলে হয়তো এমনটি হতো না।'

গুমাস্তগীন বললো, 'আমি নিজেদের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে চাই না। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের জন্য যেসব কৌশল ও টেকনিক ব্যবহার করা দরকার ছিল, তা তিনি করতে পারেননি। এ যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রথম যে কাজটি করা

দরকার ছিল, তা হলো খৃস্টানদেরকে ময়দানে টেনে আনা। তিনি খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখার দাবী করলেও তাদের কাছ থেকে কোন রকম সামরিক সাহায্য আদায় করতে পারেননি।'

'হ্যাঁ, এটা তার বড় ব্যর্থতা।'

'সে তাদের উপদেষ্টা ও গোয়েন্দাদের সাহায্য নেয়ার পরিবর্তে উন্নত মানের মদ, সুন্দরী মেয়ে ও নগদ মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য দরকার অস্ত্র ও সেনা, এ দুটোই সে চায়নি ওদের কাছে।'

গুমাস্তগীন ছিল কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও ষড়যন্ত্রে ওস্তাদ। শত্রুরা মাটির নিচে লুকিয়েও রেহাই পেতো না তার হাত থেকে। বন্ধুদেরকেও সে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিত না। সে ছিল চরম ক্ষমতালিপ্সু। ছলে বলে কৌশলে রাজ্যের পরিধি বাড়ানোই ছিল তার একমাত্র স্বপ্ন।

আইয়ুবীকে সম্মুখ সমরে হারানো যাবে না জানতো বলেই সে নিজে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। আবার সম্মিলিত শক্তি যাতে বুঝে সে তাদেরই একজন, এ জন্য পরাজিত হবে জেনেও নিজের বাহিনী পাঠিয়েছিল সে অভিযানে।

গুমাস্তগীন তার ক্ষমতার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করতো সুলতান আইয়ুবীকে। ফলে সে ছিল সুলতান আইয়ুবীর সবচে কঠিন দুশমন। সম্মুখ যুদ্ধ নয়, গুমাস্তগীন বিশ্বাস করতো আইয়ুবীকে ধ্বংস করতে হবে ষড়যন্ত্রের পিচ্ছিল পথে। গোপনে তাকে হত্যা করতে হবে। আর এ কাজে ওস্তাদ শেখ

মান্নানের ফেদাইন গুপ্তঘাতক দল। তাই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সে এসেছিল শেখ মান্নানকে ভাড়া করতে, তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে।

শেখ মান্নানও সুলতান আইয়ুবীর হত্যার ষড়যন্ত্রে খুবই উৎসাহী ছিল। তার ভাল মতোই জানা ছিল, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীই একমাত্র ব্যক্তি, যার সামরিক শক্তি ঈমানী চেতনায় পরিপূর্ণ। সমরনায়ক হিসাবে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইয়ুবী, ঈমানী বলেও তেমনি অতুলনীয়। এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যাওয়া যেমন বিপদজনক, তেমনি এমন লোককে বাঁচিয়ে রাখাও ভয়ের। কারণ অন্যায় আধিপত্য বিস্তার আইয়ুবী কিছুতেই মেনে নেবে না।

ফলে তুর্কমানের সমর শেষ হওয়ার আগেই মুসলিম মিল্লাতের দুই গাদ্দার এসে মিলিত হলো একত্রে। আইয়ুবী যখন তলোয়ার দিয়ে লিখছিল নিজের ভাগ্যের ফয়সালা, তখন শেখ মান্নান ও গুমাস্তগীন আছিয়াত কেল্লায় বসে তার ভাগ্য নির্ধারণের জল্পনা কল্পনা করছিল।

সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার এমন কৌশল আবিষ্কার করাই তাদের এ বৈঠকের উদ্দেশ্য, যেন অন্যান্য বারের মত এবারের হত্যা প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়।

গুমাস্তগীন আছিয়াত দুর্গে পৌঁছে ছিল কারিশমা ও আন নাসেররা পৌঁছার একদিন আগে। তখনো সে জানতো না, সাইফুদ্দিনের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর কাছে কেমন মার খেয়েছে। সৈন্যবাহিনীকে সমরাঙ্গণে পাঠিয়ে দিয়েই সে নেমে

পড়েছিল ষড়যন্ত্রমূলক কাজে। আর এ কাজ শেখ মান্নানকে ছাড়া অসম্ভব ভেবেই ছুটে এসেছিল আছিয়াত দুর্গে।

০

'ভাই গুমাস্তগীন!' শেখ মান্নান খাওয়া বন্ধ করে বললো, 'তোমার বাহিনীও তো তুর্কমান সমরাঙ্গণ থেকে পালিয়েছে। তুমি শুধু শুনেছো সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাদের কি হাল হয়েছে বিস্তারিত জানো না। এ জন্যই এদেরকে এখানে ডেকেছি।' সে কারিশমা ও লিজাকে দেখিয়ে বললো, 'এরা যুদ্ধের সময় ময়দানে ছিল। সব কিছু নিজ চোখে দেখেছে। আগে ওদের কাছ থেকে যুদ্ধের বিস্তারিত খবর শোন।'

গুমাস্তগীন তাকালো কারিশমাদের দিকে। কারিশমা গুমাস্তগীনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো যুদ্ধের কাহিনী। কি করে সুলতান আইয়ুবী অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সম্মিলিত সৈন্যদলকে পরাজিত করে তাক লাগিয়ে দিল। কি করে সাইফুদ্দিন নিজের সৈন্যদেরকে ময়দানে রেখেই গোপনে পালিয়ে গেল, সবিস্তারে বললো সে। গুমাস্তগীন নীরবে শুনলো তার কাহিনী।

'আমাকে আমার বন্ধুরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো।' গুমাস্তগীন লজ্জায় ও রাগে বলতে লাগলো, 'আমি সাইফুদ্দিনকে তিন বাহিনীর হেড অব দ্যা কমাণ্ড করতে মোটেই রাজি ছিলাম না। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনলো না, জানি না আমার সৈন্যরা

কি অবস্থায় আছে।'

'খুবই শোচনীয় অবস্থায় আছে!' কারিশমা বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী পলাতক সৈন্যদের নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে দিচ্ছে না। ধাওয়া করে পাকড়াও করছে তাদের।'

'ভাই মান্নান! তুমি জানো আমি এখানে কেন এসেছি?' গুমাস্তগীন বললো।

'হ্যাঁ, জানি আপনি সুলতান সালাহউদ্দিনের হত্যার পরিকল্পনা করতে এসেছেন।' শেখ মান্নান বললো।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো!' গুমাস্তগীন বললো, 'এর বিনিময়ে তুমি যা চাইবে তাই আমি দিতে রাজি! সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করো ভাই!'

'আমি খৃস্টান ও সাইফুদ্দিনের অনুরোধে চারজন ফেদাইন খুনীকে আপনি আসার আগেই এ কাজে পাঠিয়ে দিয়েছি।' শেখ মান্নান বললো, 'কিন্তু তাকে হত্যা করা খুবই কঠিন। বার বার চেষ্টা করেও আমরা সফল হতে পারিনি। এবারও যে পারবো তার কোন নিশ্চয়তা এ মুহূর্তে আমি আপনাকে দিতে পারবো না।'

'আমার কাছ থেকে পৃথক ভাবে বখশিশ নাও।' গুমাস্তগীন বললো, 'নতুন লোক দাও, যারা এ কাজে দক্ষ। আর তাদেরকে আমার অধীনে দাও, যেন আমি সরাসরি তাদের পরিচালনা করতে পারি।'

'আমি যে চারজন খুনী পাঠিয়েছি, তারা আমার বাছাই করা চার

খুনী।' শেখ মান্নান বললো, 'আমার কাছে খুনী গ্রুপের অভাব নেই। কিন্তু আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছি অন্য কারণে।'

'কেন?' গুমাস্তগীন বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আইয়ুবী কি তোমাকে কোন কেল্লা টেল্লা দিয়ে দিল নাকি?'

'না!' শেখ মান্নান উত্তর দিল, 'কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে খুন করার জন্য আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদাইন খুনী শেষ করে ফেলেছি। আমার পাঠানো ঘাতকরা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খঞ্জরের আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে, আইয়ুবী নয়, সে নিজেই নিহত হয়ে গেছে। তার ওপর আমার দক্ষ তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ করেছে, কিন্তু সে তীর তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। আমার কেন যেন মনে হয়, সুলতান আইয়ুবীর ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া আছে। তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যে শক্তির বলে তিনি খঞ্জর ও তীরের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে যান। আমার গোয়েন্দারা বলেছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর যতবার আক্রমণ চালানো হয়েছে, ততবারই তিনি সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন অলৌকিকভাবে। আক্রমণ হলে তিনি ভীত বা রাগান্বিত হতেন না। আক্রমণ প্রতিহত করে এমনভাবে হাসতেন, যেন কিছুই হয়নি।'

'ভাই মান্নান, রাখো তো এসব প্যাঁচাল। আগে বলো, কতো চাও?' গুমাস্তগীন বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমি সুলতান আইয়ুবীকে আর জীবিত দেখতে চাই না। আনাড়ী খুনীদের ব্যর্থতার কাহিনী বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসো।'

'আনাড়ী নয়, আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম, তারা প্রত্যেকেই এ কাজে ওস্তাদ ছিল।' শেখ মান্নান বললো, 'আইয়ুবী ছাড়া তাদের হাত থেকে কেউ কোনদিন বাঁচতে পারেনি। তারা মৃত্যুকে ভয় করার মত লোক ছিল না। আমার কাছে এখনও এমন ওস্তাদ লোক রয়েছে, যারা বহু গুপ্তহত্যার নায়ক। তারা এমন কৌশলে হত্যাকাণ্ড চালায় যে, কাকপক্ষীও টের পায় না। কিন্তু ভাই গুমাস্তগীন, আমি আমার এত মূল্যবান ফেদাইনদের আর এমনভাবে বৃথা নষ্ট করতে পারবো না। তোমরা তিন বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি নিয়েও তার কিছু করতে পারলে না, আর আমার মাত্র তিন-চারজন ফেদাইনকে দিয়ে কেমন করে তাকে হত্যা করাতে চাও?'

'বুঝেছি, তুমি আইয়ুবীর শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেছো।'

'না! আমি ভয় পাইনি। সুলতান আইয়ুবীর সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।' শেখ মান্নান বললো, 'হাসান বিন সাব্বাহ পয়গাম্বর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমাদের এই দল পেশাদার খুনী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। বুঝলে ভাই গুমাস্তগীন! আমি এখন একটি পেশাদার খুনীচক্রের নেতা! প্রশ্নটা ভয়ের নয়, প্রশ্নটা পেশার। এখন যদি সুলতান আইয়ুবী আমাকে টাকা দিয়ে বলে তোমাকে হত্যা করতে, তবে আমি তোমাকেও হত্যা করতে পারবো।'

'কিন্তু সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কাউকে কাপুরুষের মত টাকা দিয়ে হত্যা করান না।' লিজা বললো, 'সেই কারণেই তিনি কাপুরুষদের আঘাতে ও ষড়যন্ত্রে মৃত্যুবরণ করছেন না।'

'বাহ! তুমি এই বয়সেই বুঝতে শিখেছো যে, যে কাপুরুষ নয়, তাকে কাপুরুষরা হত্যা করতে পারে না!' শেখ মান্নান তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদরের ছলে বললো।

গুমাস্তগীন আশাহত হয়ে গুম মেরে বসে রইলো। শেখ মান্নান তাকে বললো, 'ভাই গুমাস্তগীন, তুমি, সাইফুদ্দিন ও আল মালেকুস সালেহ এবং খৃস্টানরা শুধু এই কারণে পরস্পর বন্ধু সেজে রয়েছো যে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তোমাদের সবারই শত্রু। নতুবা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বন্ধুত্বের বন্ধন নেই। আচ্ছা, আমাকে বলো তো, আইয়ুবীকে হত্যা করে তোমরা কি লাভ করতে চাও? তিনি মারা গেলে তখন তো তোমরা নিজেরাই মারামারি করে মরবে।'

গুমাস্তগীন চুপ। সে এসব প্রশ্নের কোনই জবাব দিল না। শেখ মান্নান আবার বললো, 'ভাই গুমাস্তগীন! খুব মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনে নাও! আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারলেও তোমরা নতুন করে এই সাম্রাজ্যের এক ইঞ্চি জায়গাও দখলে নিতে পারবে না। এ সাম্রাজ্য এখনো আইয়ুবীই ধরে রেখেছেন! তিনি তার সৈনিকদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনা ও জেহাদী জযবা সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে কারণেই এখনো খৃস্টানরা এখানে দাঁত বসাতে পারছে না।

তুমি যদি কাউকে হত্যা করতেই চাও, তবে সাইফুদ্দিনকে টার্গেট নাও। সাইফুদ্দিনকে হত্যা করে মুশেলের ওপর তোমার আধিপত্য কায়েম করো। অবশ্য তাঁকে তুমি নিজেই হত্যা করতে পারবে, এ জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। সে

তোমাকে বন্ধু হিসেবে জানে এবং তোমরা উভয়েই মিত্র বাহিনীর সদস্য। তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারো অথবা সুযোগমত আক্রমণ করেও হত্যা করতে পারো।'

শেখ মান্নানের দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলো। গুমাস্তগীন গভীর চিন্তায় ডুবে রইলো এ বক্তব্য শুনে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, 'হ্যাঁ, তুমি সাইফুদ্দিনকেই হত্যা করার ব্যবস্থা করো। বলো, এর বিনিময়ে তুমি কি চাও?'

'তোমার সখের হারান দুর্গ!' শেখ মান্নান বললো।

'তোমার মাথাটা তো ঠিক আছে, মান্নান!' গুমাস্তগীন বললো, 'ইয়ার্কী রাখো। হীরা, জহরত, অর্থ, সম্পদ ও বিত্ত দিয়ে তোমার মূল্য চাও।'

'ধন-রত্নের বিনিময়ে তোমাকে চারজন লোক দিতে পারি।' শেখ মান্নান বললো, 'কিন্তু এরা আমার গুপ্ত বাহিনীর সদস্য নয়। ওরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর স্পেশাল কমাণ্ডো। তাদেরকে এই দুই মেয়ে হাশিশ পান করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আমার কাছে এরা খুবই মূল্যবান সম্পদ। আমি এদেরকে অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেয়ার কথা কখনো চিন্তাও করিনি, কারণ এমন যোগ্য ও দক্ষ কমাণ্ডো কোথাও পাওয়া যায় না। কপাল গুণে ওদের পেয়ে গেছি আমি। তুমি তো জানো, ফেদাইনদের হরেক রকম নেশার দ্রব্য ও সম্মোহন বিদ্যা যে কোন মানুষকে আমূল বদলে দিতে পারে। এই পরীরা তাদেরকে হাশিশের নেশায়, তাদের রূপ-যৌবনের নেশায়, এমন যোগ্য বানিয়ে নিবে যে, এরা শেষ পর্যন্ত আপন বাবা-মাকেও হত্যা করতে

পিছপা হবে না।
এই সম্পদ আমি হাত ছাড়া করতাম না, কিন্তু আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাই না। তুমি কষ্ট করে এবং বড় আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছো, এ জন্যই আমি এদেরকে তোমার হাতে তুলে দিতে রাজি হলাম। তুমি ওদের নিয়ে যাও, কিছু দিন এদেরকে আমার পরীদের দিয়ে স্বপ্নের জান্নাত দেখাও। তাদেরকে তোমার মহলের রাজকুমার বানিয়ে নাও। গোপনে মাত্রানুযায়ী হাশিশ পান করাও এবং কায়দা করে মদের মধ্যে ডুবিয়ে দাও, দেখবে তোমার ইশারায় ওরা নাচবে।'
'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা এত কচি খোকা নয়, যেমন তুমি বুঝাতে চাচ্ছো।' গুমাস্তগীন বললো।
'তুমি তো জানো গুমাস্তগীন, আমাদেরকে ফেদাইন বলা হয়। আমরা মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে খেলা করি।' শেখ মান্নান বললো, 'আমরা আমাদের শিকারীকে মনভোলানো স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যাই। সম্মোহিত করে তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাই যে, তার সামনে যা বলা হয় তাকেই সে বাস্তব মনে করে নেয়। তার সামনে নারীর সুন্দর ছবি এঁকে বলো, এ হচ্ছে বেহেশতের হুর, সে তাই বিশ্বাস করবে। হাতে পাথর দিয়ে বলো, এ হচ্ছে স্বর্ণের টুকরো, সে তার হাতে স্বর্ণের টুকরোই দেখতে পাবে। তাকে নারীর বাহুলগ্ন করে দাও, খুব কম মূল্যে তার ঈমান ও বিশ্বাস কিনতে পারবে।'
শেখ মান্নান তাকে আরো বললো, 'তুমি এই চারজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এরা

তোমার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না।' শেখ মান্নান একটু হেসে বললো, 'তুমি তোমার নিজেকে নিয়েই চিন্তা করো। নারী, মদ ও বিলাসিতা তোমাকে কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে? তুমি মুসলমান হয়েও মুসলমানের শত্রু হয়ে গিয়েছো।'

দরদাম ঠিক করে শেখ মান্নান আন নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে তুলে দিল গুমাস্তগীনের হাতে। বললো, 'এদেরকে কারাগারে রেখো না বরং রাজপুত্রের মত রাখবে।'

গুমাস্তগীন তার পরামর্শ মেনে নিল। খাওয়া দাওয়ার পর এই বলে বিদায় নিল, 'দু'একদিনের মধ্যেই কমাণ্ডোদের নিয়ে আমি রওনা করতে চাই।'

'আপনি আমার মেহমান। যতক্ষণ খুশী থাকবেন, যখন ইচ্ছে বলবেন, আমি আপনার যাত্রার ব্যবস্থা করবো।' বললো শেখ মান্নান।

০

গুমাস্তগীন খাওয়া দাওয়া শেষে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। একটু পর সেখানে প্রবেশ করলো মান্নানের এক নিরাপত্তা প্রহরী। জিজ্ঞেস করলো, 'আজ যে চারজন কমাণ্ডোকে ধরে আনা হয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনার আদেশ কি?'

'হারানের শাসক গুমাস্তগীন এসেছেন।' শেখ মান্নান বললো, 'তিনি তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তোমরা তাদের আহারাদি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। কিন্তু তাদেরকে কোথায়

পাঠানো হচ্ছে, তা ওদের বলার দরকার নেই।'

প্রহরী চলে গেল। সে আন নাসের ও তার সঙ্গীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলো। খাবারের সামগ্রী তাদের সামনে দেয়ার পর আন নাসের খাবার খেতে অস্বীকার করে বললো, 'এ খাবার আমরা গ্রহণ করবো না, নিশ্চয়ই এতে হাশিশ মিশানো আছে।'

আন নাসের ও তার সাথীদের এমন সন্দেহের সঙ্গত কারণও ছিল। কারণ তাদের সামনে যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল, তা ছিল উন্নতমানের শাহী খাবার। এমন খাবার সচরাচর সাধারণ লোকে খায় না। বন্দীদের জন্য এমন খাবারের ব্যবস্থা করার তো প্রশ্নই উঠে না।

প্রহরী অনেক কষ্টে তাদের বুঝালো যে, এতে কিছু মিশানো হয়নি। কেল্লায় শাহী মেহমান এসেছেন। তাদের সম্মানে এ রান্নার আয়োজন করা হয়। অনেক করে বুঝানোর পর আন নাসের ও তার সাথীরা এ খাবারই খেতে রাজি হয়ে গেল, কারণ এমনিতেই তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিল।

শেখ মান্নান কারিশমাকে বললো, 'তুমি চলে যাও, লিজা এখানেই থাকুক।'

কারিশমা বললো, 'সে গত তিন চার দিন অনবরত সফরে ছিল, এখন তার বিশ্রাম দরকার। আজকের মত ওকে তার কামরায় যেতে দিন।'

শেখ মান্নানের মধ্যে তখন পশুত্ব জেগে উঠেছে। সে কারিশমার আবদারের তোয়াক্কা না করে হাত বাড়ালো লিজার

দিকে। তাকে ধরে টানা-হেঁচড়া করতে লাগলো। লিজার মনে পড়ে গেলো কারিশমার অনুরোধ, ফলে সে তেমন জোরালো ভাবে বাঁধা দিতে পারছিল না। সে এঁকেবেঁকে তার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল খুঁজতে লাগলো।

মান্নান হাত দিয়ে টানাটানি করছে, পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত এই অসভ্যতা দেখছে কারিশমা। লিজার মেজাজ ও চেহারা বিগড়ে গেছে ক্ষোভে। হঠাৎ কামরার দরজা খুলে গেল! দারোয়ান বললো, 'এক আগন্তুক আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

শেখ মান্নান রাগের সাথে বললো, 'গর্দভ, এটা কি কারো সাথে সাক্ষাতের সময়! ভাগো এখান .....।'

শেখ মান্নানের কথা তখনো শেষ হয়নি, দরজা ঠেলে অনুমতি ছাড়াই ভেতরে ঢুকলো এক আগন্তুক। দারোয়ানকে এক পাশে সরিয়ে মুখোমুখি হলো শেখ মান্নানের। বিস্মিত শেখ মান্নান, লিজা ও কারিশমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে।

৩

সে লোকটি ছিল এক খৃস্টান ক্রুসেডার। সে যেই মাত্র কামরায় প্রবেশ করলো সঙ্গে সঙ্গে শেখ মান্নান তাকে চিনতে পেরে তার নাম ধরে উৎসাহের সাথে বলে উঠলো, 'আরে তুমি!'

আগন্তুক হাত বাড়িয়ে দিল, শেখ মান্নান সে হাত লুফে নিয়ে বললো, 'কখন এলে?'

'এই মাত্র।'
'ঠিক আছে। এখন তাহলে গিয়ে বিশ্রাম করো, সকালে তোমার সাথে আলাপ হবে।'
'আমি হয়তো সকালেই আপনার সাথে দেখা করতাম।' ক্রুসেডার বললো, 'কিন্তু এখানে এসেই জানতে পারলাম, এখানে আমাদের দু'টি মেয়ে এসেছে। তাদের সাথে আমার জরুরী আলাপ আছে। আমি ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।'
'ঠিক আছে, তোমার লোক তুমি নেবে এতে আমার আপত্তির কি আছে। এখন গিয়ে বিশ্রাম করো, সকালে আমি ওদেরকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবো।'
'না।' ক্রুসেডার প্রবল আপত্তি তুলে বললো, 'ওদেরকে আমার এখনি দরকার।'
শেখ মান্নানের আঁতে ঘা লাগলো। সে এ কেল্লার সর্বাধিনায়কই শুধু নয়, সারা দেশের ফেদাইনদেরও নেতা। যে ফেদাইনদের নাম শুনলে শিউরে উঠে আমীর ওমরা ও অভিজাত মানুষের বুক। গুপ্তহত্যার মত নিষ্ঠুর কাজে যাদের কোন জুড়ি নেই।
সে কিছুটা ক্ষোভের সাথেই বললো, 'কি এমন জরুরী বিষয় যে, এখন, এই মুহূর্তেই তা বলতে হবে? যদি এতোই জরুরী হয় তাহলে এখানে বসেই আলাপ শুরু করো না কেন?'
খৃস্টান ক্রুসেডারদের তখন দাপটই ভিন্ন। ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যের শাসক বা ফেদাইনদের মত খুনী ও সন্ত্রাসীরা তাদের অনুকম্পার ভিখারী। সে শেখ মান্নানের কথা গায়ে না মেখে

ক্ষমতার দাপট জাহির করে বললো, 'শেখ মান্নান, তুমি ভাল করেই জানো আমি কি রকম ব্যস্ত। আর তুমি এ কথাও জানো, এই মেয়েদের দায়িত্ব কি? তোমার কোলের কাছে বসে থাকা এদের দায়িত্ব নয়। আমি ওদের সাথে কি আলাপ করতে চাই তা এ মুহূর্তে তোমার না জানলেও চলবে। এখন আমি এই দু'জনকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার আর কিছু বলার আছে?'

শেখ মান্নানকে এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়েই ক্রুসেডার মেয়ে দু'টিকে বললো, 'এসো তোমরা, চলো আমার সঙ্গে।'

লিজা ও কারিশমা দু'জনেই দ্রুত আগন্তুকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'তুমি কি আমার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাও?' শেখ মান্নান বললো, 'তুমি এখনও আমার কেল্লার মধ্যে। আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে অতিথি থেকে কয়েদী বানিয়ে দিতে পারি। তুমি কি তাই চাও? মেহমান না হয়ে বন্দী হতে চাচ্ছো তুমি?' সে গর্জন করে বললো, 'মেয়েটাকে আমার কাছে রেখে তুমি এখন বাইরে চলে যাও।'

'মান্নান!' খৃস্টান লোকটি দাঁতে দাঁত চেপে রাগে গর্জন করে বললো, 'তুমি কি আসলেই ভুলে গেছো, এ কেল্লা তোমাকে আমরাই উপহার দিয়েছিলাম? তুমি কি এই সত্যটুকুও ভুলে গেছো যে, আমরা যদি তোমাদের বাঁচিয়ে না রাখতাম তবে তুমি এবং তোমার ফেদাইন দলের অস্তিত্বই আজ বিলীন হয়ে যেতো?'

শেখ মান্নানের মাথায় তখন মদের নেশার সাথে কেল্লা প্রধানের গর্ব এবং অহংকারও চেপে বসেছিল। উত্তেজনা উস্কে দিয়েছিল তার অহংবোধকে। সে যে এক গোপন খুনী চক্রের নেতা, যারা যে কোন সময় মানুষের সন্দেহের উর্ধে উঠে মানুষ খুন করতে পারে, এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছিল তার মগজের কোষে কোষে।

তার মনে পড়ে গেল, অতীতে খৃস্টান অফিসারদের হত্যার কথা। পারস্পরিক শত্রুতার কারণে এক অফিসার অন্য অফিসারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে সহযোগিতা নিয়েছে তার। সামরিক অফিসার ছাড়া প্রভাবশালী সাধারণ খৃস্টানরাও কখনো কেউ শত্রুতার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে তারই শরণাপন্ন হতো। সে সব অভিযানের তুলনায় এক অর্বাচীন দেমাগী খৃস্টানকে খুন করা তার কাছে কোন বিষয়ই ছিল না।

শেখ মান্নান ভাবছিল, এ লোকটি কি ভুলে গেছে, সে এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? এই সে আছিয়াত, যে দুর্গকে মানুষ জানে প্রেতাত্মার কেল্লা বলে। এ কেল্লার মধ্যে একজন দু'জন মানুষের গুম হয়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারই নয়।

ফেদাইনরা ছিল আক্ষরিক অর্থেই নিরেট রক্তচোষা। দয়ামায়া বলে কোন কিছুর সাথে তাদের আদৌ পরিচয়ই ছিল না। খুন করা তাদের কাছে মুখের থুতু ফেলার সমতুল্য।

শেখ মান্নান তাকিয়েছিল দেয়ালের দিকে। এ কেল্লার দেয়াল ও কার্নিশ জুড়ে রং-বেরংয়ের কাঁচের নকশা, ঝাড়বাতির মায়াবী আলো। এ সব দেখে এখানে এলে মানুষ ভুলে যায়, এই

কেল্লার ভেতরে এবং তার আশেপাশে কত শত নির্দয় ও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে। আর এসব সমুদয় ঘটনার নেপথ্য নায়ক শেখ মান্নান। তার সামান্য ইশারার কাছে মানুষ কত অসহায়, জানে মান্নান। মানুষের সেই অসহায়ত্ব দেখতে দেখতে তার মনে জন্ম নিয়েছিল এমন এক অহমিকা, যার কারণে আক্ষরিক অর্থেই সে ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। পৃথিবীর দাম্ভিক সম্রাটদের চাইতেও নিজেকে অধিক ক্ষমতাবান ভাবতো সে। আর এ ভাবনার কারণেই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল পশুত্ব ও বর্বরতা। বন্য জন্তুর মতই হিংস্রতা গ্রাস করে নিয়েছিল তাকে।

লিজার মত এমন সুন্দরী মেয়েকে হাতছাড়া করতে চাইল না সে। যতটা সম্ভব নিজেকে দমন করে খৃস্টান প্রতিনিধিকে বললো, 'আমি তোমাকে আবারও চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি। এই কেল্লাতে আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতাও গুম হয়ে যায়। আর সে গুমের খবর আল্লাহ পর্যন্ত জানতে পারে না। আমি এই মেয়েকে কেল্লার বাইরে যেতে দেবো না। যদি তুমি জোর খাটাতে চাও তবে তুমিও কেল্লার বাইরে যেতে পারবে না।'

'আমার এক সাথী এইমাত্র কেল্লার ফটক থেকে বিদায় নিল।' খৃস্টান লোকটি বললো, 'সে জানে আমি এখানে দু'তিন দিন থাকবো। এরপর আমিও গিয়ে শরীক হবো তাদের সাথে। যদি আমি যথাসময়ে সেখানে না পৌঁছি, তাহলে আমি যে এখানে বন্দী এ কথা তাদের জানতে বাকী থাকবে না। এর পরিণতি কি হতে পারে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে আমি

মনে করি না।'

সে আরও বললো, 'আমি এখানে এসেছি এই অধিকার নিয়ে যে, এই কেল্লা আমাদেরই আশ্রয়স্থল ছিল। বিশেষ করে দূর পথের বিশ্রামাগার হিসাবে আমরা এটা ব্যবহার করতাম। তোমাকে অনুগ্রহ করে আমরা এই দুর্গ দান করেছি। কখনো ভাবিনি, এর ফলে অতিথি হিসাবে এখানে আমাদের আর কখনো জায়গা হবে না।'

'স্বীকার করি, এ কেল্লা তোমরাই আমাকে দান করেছো। কিন্তু দান করার পরদিন থেকে এর মালিক আর তোমরা নও, আমি। আর আমি এটা তোমাদের কাছ থেকে এমনিতেই পাইনি, আমার অতীত কাজের পুরস্কার হিসাবেই এটা আমি পেয়েছি। তারপরও বরাবর আমি তোমাদের এখানে থাকতে দিয়েছি। কিন্তু তুমি অতিথির সীমা অতিক্রম করে কর্তৃত্ব ফলাতে চাইছো। তুমিই আমাকে বাধ্য করছো তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে।'

'যদি তুমি আমাদের হাড় শুদ্ধ গায়েব করে দাও তবুও তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এখানে আমাদের এক লোক ও দু'টি মেয়ে ছিল, তারা কোথায়? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি কখনো শুভ হবে না।' আগন্তুক খৃস্টানটি বললো, 'কিন্তু একটি সুযোগ তোমাকে দিতে পারি। যদি তুমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারো, তবে তোমাকে শুধু এই মেয়েটি কেন, এরূপ এক ডজন সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে।

তুমি তো আমাদের দেয়া অর্থ, সোনা-দানা সব হজম করে বসে আছো, অথচ চুক্তিমত এখনো সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারোনি। তুমি বলেছো, তোমার চার ফেদাইন খুনীকে সুলতান আইয়ুবীর হত্যার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছো, কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। আইয়ুবী এখনও বহাল তবিয়তে আছেন ও বিজয়ীর বেশে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন।'

'আমি মিথ্যা বলিনি।' শেখ মান্নান রাগ সামলে বললো, 'আমি চার ফেদাইনকে সত্যি পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যেই তোমরা এ সুসংবাদ পেয়ে যাবে যে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিহত হয়েছেন।'

'তোমার এ আশা যদি সফল হয় তাহলে আমি অঙ্গীকার করছি, তোমাকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে সব পুরস্কার দান করা হয়েছে এবং হবে, সে সব পুরস্কার ছাড়াও তোমাকে লিজার মত আরও দু'টি মেয়ে আমার তরফ থেকে উপহার দেয়া হবে।'

'আচ্ছা, সেটা সময় হলেই দেখা যাবে!' শেখ মান্নানের কণ্ঠে আক্ষেপ ও আপোসের সুর, 'হ্যাঁ, যাও একে নিয়ে যাও। আমি কেল্লার মধ্যে খৃস্টানদের জন্য যে সব কামরা খালি করে রেখেছি, সে সব কামরাতে চলে যাও। সেখানে থাকো, খাও, পান করো আর আমোদ-স্ফূর্তি করো। কিন্তু চিন্তা করে উত্তর দিও, লিজাকে আমার কাছে রেখে যাবে কি না?'

'ঠিক আছে আমি চিন্তা করে দেখবো।' বললো খৃস্টান লোকটি, 'তাহলে এবার আমরা যাই?'

যাও। কিন্তু আমার অনুরোধের কথাটা মনে রেখো। এই মেয়েটাকে তুমি আমার স্বপ্নপুরী থেকে বের করে নিয়ে যেও না। আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, একে কেল্লা থেকে বের করে নেয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না।'

খৃস্টান অফিসার মেয়ে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল। এ লোক ছিল খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার। গোয়েন্দাবৃত্তি ছাড়াও নাশকতামূলক কাজে যারা ওস্তাদ ছিল, সেই বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তা ছিল সে। সে এবং তার অন্যান্য সঙ্গীরা মুসলিম এলাকায় ঘুরে ফিরে গোয়েন্দাগিরি করতো আর সুযোগ পেলেই লিপ্ত হতো নাশকতামূলক কাজে। আছিয়াত দুর্গ শেখ মান্নানকে দান করার পরও এ কেল্লায় খৃস্টানদের ছিল অবাধ যাতায়াত। এখানে তাদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। যখন ইচ্ছা খৃস্টানরা এখানে এসে থাকতে পারতো। সাধারণত এ কেল্লাকে ওরা ব্যবহার করতো বিশ্রামের ঘাঁটি হিসাবে।

গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরাই এখানে বেশী আসতো। কারিশমারও জানা ছিল এ খবর। সেই সুবাদেই লিজা এবং আন নাসেরদেরকে নিয়ে সে এখানে এসেছিল। সঙ্গীদের নিয়ে এখানে আশ্রয় নেয়ার সময় সে ভাবতেও পারেনি, এখানে এসে সে এক অনাকাঙ্খিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে।

খৃস্টান অফিসারটিরও জানা ছিল না, এখানে কারিশমা ও লিজারা এসেছে। মরুভূমির উত্তাপে ক্লান্ত হয়ে এখানে সে এসেছিল

বিশ্রামের জন্য। ইচ্ছে ছিল, দু'একদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার সে তার পথ ধরবে। কেল্লায় প্রবেশের সময় দ্বার রক্ষীদের কাছ থেকেই সে জেনেছিল, এখানে দু'টি খৃস্টান মেয়ে এসেছে। কে হতে পারে? প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই মেয়েদের দেখার আগ্রহটা জেঁকে বসলো তার মনে। খবর নিয়ে জানতে পারলো, তারা এখন শেখ মান্নানের কাছে আছে। মেয়ে দু'টিকে দেখার আগ্রহ নিয়ে সে শেখ মান্নানের মহলের ভেতরে প্রবেশ করলো। কিন্তু প্রহরী তাকে বাঁধা দিতেই জেদ চেপে বসলো মনে, প্রহরীকে অগ্রাহ্য করে সে ঢুকে পড়লো শেখ মান্নানের খাস কামরায়।

শেখ মান্নান তাকে চিনতো। তার সাথে শেখ মান্নানের ঝগড়া হবে এমন ভাবনা তার মনে কখনো উদয় হয়নি। কিন্তু কামরায় ঢুকেই সে এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, ঝগড়া শেষ পর্যন্ত খারাপের দিকে মোড় নিতে গিয়েও আর নেয়নি। নিলে পরিস্থিতি তার জন্য খারাপই হতো। শেখ মান্নান তার স্বভাবের বিপরীতে আপোষ রফায় এসে বরং তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। যেভাবে কথা কাটাকাটি ও উচ্চবাচ্য চলছিল, শেখ মান্নান নত না হলে ভয়ংকর দিকে গড়াতে পারতো ঘটনা।

সে মেয়েদের নিয়ে বেরোতে বেরোতে বললো, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়! আরেকটু হলে একটা খুনাখুনি হয়ে যেতো।'

মেয়েরা এর কোন জবাব দিল না। চুপচাপ তার সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে গেলে শেখ মান্নান হাত তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উদয় হলো তার একান্ত নিজস্ব কিছু অনুচর। সে তাদের বললো, 'এই খৃস্টান ও মেয়ে দু'টি আমাদের বন্দী নয়, তবে তাদেরকে ইচ্ছামত কেল্লা থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। ফটকে বলে দাও, আমার অনুমতি ছাড়া এদের যেন বাইরে যেতে দেয়া না হয়। যখন চাইবে বাইরে যাবে, যখন ইচ্ছা আসবে এ অধিকার তারা নিজেরাই হারিয়েছে। বন্দী না হলেও কেল্লায় তাদের গতিবিধির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে।'

অনুচররা বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো শেখ মান্নান তাদের ডেকে বললো, 'আর শোন, গুমাস্তগীন যখন চায় তার যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। মেয়ে দু'টি সঙ্গে করে যে চার বন্দীকে নিয়ে এসেছে সে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

•

হাঁটতে হাঁটতে খৃস্টান গোয়েন্দা অফিসারকে কারিশমা জানালো, 'হারানের আমীর গুমাস্তগীন এখন এ কেল্লাতেই অবস্থান করছেন। তিনি সুলতান আইয়ুবীকে গোপনে হত্যা করার ব্যবস্থা করতে এখানে এসেছেন।'

তাকে আন নাসের ও তার সাথীদের সম্পর্কেও জানানো হলো। খৃস্টান অফিসার বললো, 'আগে কামরায় চলো। ওখানে গিয়ে আলাপ করাটাই নিরাপদ। এ অবস্থায় আমাদের কি করণীয় তা খুব ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে এবং আমাদের পরিকল্পনা শেখ মান্নানের লোকদের জানানো যাবে না।'

সে মেয়ে দু'টিকে কেল্লার এমন অংশে নিয়ে গেল, যেখানটা শুধু আগত খৃস্টান মেহমানদের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল। এ অংশটা খৃস্টানরাই নিয়ন্ত্রণ করতো এবং এ অংশটুকুই ছিল এ কেল্লায় তাদের নিরাপদ স্থল।

০

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সাইফুদ্দিনের সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনের আক্রমণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে তাদের পিছু সরতে বাধ্য করেছিলেন। লড়াইয়ের প্রচণ্ডতায় তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়েছিল। বাকীরা হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পন করেছিল।
কিন্তু মুজাফফরুদ্দিন এ যুদ্ধে নিহত বা ধৃত হয়নি। সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। নিখোঁজ সেনাপতি কোথায় লুকিয়েছে আইয়ুবীর গোয়েন্দারা তখনও তার সন্ধানে চষে ফিরছে পাহাড়-প্রান্তর।
সুলতান আইয়ুবী যেসব সৈন্যদের বন্দী করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল সাইফুদ্দিনের বিশিষ্ট উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন জঙ্গী। এক সময় তিনি মুশেলের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন।
সুলতান আইয়ুবী ফখরুদ্দিন জঙ্গীকে সাধারণ বন্দীদের থেকে পৃথক করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিলেন।
গনিমতের মাল ভাগ করে সুলতান আইয়ুবী প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বসলেন, আরও অগ্রসর হবেন, নাকি পলাতকদের

পিছু ধাওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে এ অভিযান। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এ সময় সুলতান আইয়ুবী দোটানায় ভুগছিলেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস এই বীর মুজাহিদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য বহন করে। এটা সত্য, শত্রু সেনাদের বেধড়ক পিছু ধাওয়া করলে হয়তো তিনি শত্রুদের আরো ব্যাপক ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করতে পারতেন কিন্তু এতে তাঁর নিজের বাহিনীও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতো।

তিনি সৈন্যদেরকে অধিক দূর পিছু অনুসরণ না করে ফিরে আসার হুকুম জারি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুজাফফরুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি যে মূল্য দিয়েছিলেন, তা যেন আর না বাড়ে। কারণ এ যুদ্ধে তাঁর সৈন্য বাহিনীর অনেক চৌকস যোদ্ধাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। আহতদের সংখ্যাও ছিল বেশ। এ জন্যই তিনি অভিযান চালাতে বা বেপরোয়া পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন।

তিনি পিছু ধাওয়া করলে, রিজার্ভ বাহিনীকে ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু তিনি তা করতে রাজি ছিলেন না। আরও একটি কারণে অভিযান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কারণটি হলো, মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তপাত তিনি বাড়াতে চাননি। জাতিকে এমন সংঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা।

সুলতান আইয়ুবী সাইফুদ্দিনের নিজস্ব তাঁবুর সামনে

দাঁড়িয়েছিলেন। সেই বিশাল তাঁবুটি ছিল মূল্যবান রেশমী কাপড়ের। রেশমী কাপড়ের সামিয়ানা ও পর্দা তখনো ঝলমল করছিল। মনে হচ্ছিল যুদ্ধের মাঠ নয়, কোন আলীশান মহলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

ইয়াজুদ্দিন নামে সাইফুদ্দিনের এক ভাতিজা সুলতান আইয়ুবীর সেনাদলের কমাণ্ডার ছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্য, দ্বীনের খাতিরেই ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। শুধু ইয়াজুদ্দিন নয়, সৈনিকদের মধ্যে আরো অনেকেই ছিল, যারা তাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এই সময়ে।

সুলতান আইয়ুবী সাইফুদ্দিনের তাবুর শানশওকত দেখে তার ভাতিজা ইয়াজুদ্দিনকে ডাকলেন। ইয়াজুদ্দিন হাজির হলে তিনি একটু হেসে বললেন, 'তোমার চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ এখন তুমি। এই তাঁবু আমি তোমাকেই দান করছি। এটা তুমি গুছিয়ে নাও।'

সুলতান আইয়ুবী হাসি মুখেই তাঁবুটি তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনেই ইয়াজুদ্দিনের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। আপন চাচার স্নেহ ও আদরের কথা মনে পড়ে গেল তার। চাচার পরাজয়ের কাহিনী তাকে লিখতে হচ্ছে নিজের তরবারী দিয়ে! এ কথা মনে হতেই আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, ঝাপসা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো ক'ফোটা অশ্রু।

সুলতান আইয়ুবী তার মনের আবেগ লক্ষ্য করে বললেন, 'ইয়াজুদ্দিন! আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে অপ্রস্তুত করার জন্য বা কষ্ট দেয়ার জন্য এখানে

ডেকে আনিনি। এ সম্পদ তো আমাকে কাউকে না কাউকে দান করতেই হতো! ভাবলাম, গনিমতের এ অংশটুকু তোমারই প্রাপ্য। আমাকে ভুল বুঝো না, এ সম্পদ অন্যের ঘরে যাওয়ার চাইতে তোমার কাছে থাকাই ভাল।'

'কিন্তু...'

'না, এখানে 'কিন্তু'র কোন অবকাশ নেই। চাচার প্রতি তুমি কোন জুলুম করোনি, বরং তোমার চাচা নিজেই তার নিজের প্রতি জুলুম করেছে। এ ঘটনায় তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। তুমি তো কেবল তোমার মালিক ও সৃষ্টিকর্তার হুকুম তামিল করেছো। কুরআনের নির্দেশের বাইরে নিজের খেয়াল খুশী মতো তুমি কিছুই করোনি।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে শান্তনা দেয়ার জন্য আরো বললেন, 'মনে রেখো, আমার সন্তান যদি জিহাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিরোধ করতে চায় হকের অগ্রযাত্রা, সে বাঁধা দূর করতে আমার তলোয়ার তার শিরচ্ছেদ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। আপন সন্তানের বুকে ছুরি চালাতে একটুও কাঁপবে না আমার হাত।

তুমি তোমার চাচার পরাজয়ের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করছো। কিন্তু আমি আমার অপরাধী সন্তানের শিরচ্ছেদ করেও অশ্রু বিসর্জন করবো না।'

সুলতান আইয়ুবী তুর্কমানের এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছুটা দূরে দীর্ঘস্থায়ী এক ক্যাম্প করে সেখানে অবস্থান করা শুরু করলেন। জায়গাটি ছিল পাহাড় পরিবেষ্টিত। ইতিহাসে এলাকাটির নাম

'কোহে সুলতান' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেখান থেকে হলব শহর মাত্র পনেরো মাইল দূরে ছিল।

আল মালেকুস সালেহ তখনো হলব শহরকে তার রাজধানী বানিয়ে রেখেছিল। সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল এই হলব। আমরা আগেই জেনেছি, এই শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে যে বাহিনী মোতায়েন ছিল, তারা সবাই ছিল সাহসী ও বীর যোদ্ধা। সবাই ছিল মুসলমান। সেখানে আইয়ুবী বিরোধী প্রচারণা এত তীব্র ছিল যে, তারা আইয়ুবীকেই মনে করতো ইসলামের দুশমন। হলবের সৈনিকরা আইয়ুবীকে মনে করতো রাজ্যলোভী। এই চেতনা ছিল বলেই তারা সুলতান আইয়ুবীর অবরোধকে ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিল। সবকিছু বুঝেও সুলতান আইয়ুবী এ জন্যই অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছিলেন যে, নইলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতো এবং এর সবক'টি প্রাণ ছিল মুসলমানের।

কোহে সুলতানে বসে সুলতান আইয়ুবী আর একবার এই শহর অবরোধ করবেন কিনা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। পরিকল্পনা করছিলেন আগামী অভিযানের। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বাহিনীকে আরো সুরক্ষিত ও দৃঢ় না করে সম্মুখে অগ্রসর না হওয়াই ভাল।

কারণ ব্যবধান অল্প হলেও এ পনের মাইল পথের মাঝেই পর পর রয়েছে দু'টি সুরক্ষিত কেল্লা। আইয়ুবীর সম্মুখ অগ্রযাত্রায় এ কেল্লা দু'টি মস্তবড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এর একটি দুর্গের নাম মুমবাজ ও অপরটি বুজা। এই দুই

কেল্লার অধিপতি ছিল দুই স্বাধীন মুসলিম আমীর। আশেপাশে আরও কয়েকটি কেল্লা এবং পরগনা ছিল যার শাসকও ছিল মুসলমানরা। কিন্তু খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের ফলে এরা সবাই ছিল আইয়ুবীর বিরোধী এবং খৃস্টানদের বরকন্দাজ। গোটা ইসলামী সাম্রাজ্য এভাবে খৃস্টান ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল এবং ছোট ছোট কেল্লা, পরগণা ও জমিদারীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সুলতান আইয়ুবী এই বিভক্ত রাজ্যগুলোকে আবার একত্রিত করে এক শক্তিশালী ইসলামী সালতানাত গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন এবং সবাইকে একই খেলাফতের অধীনে আনার চেষ্টা করছিলেন। যুদ্ধের পাশাপাশি এ জন্য তার কুটনৈতিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, এসব কেল্লাধিপতি, জায়গীরদার ও আমীরদের কারো মনেই জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণ চিন্তা ছিল না। তারা প্রত্যেকেই ছিল ক্ষুদ্র মানসিকতা সম্পন্ন এবং নিজের পরগণা ও জমিদারী নিয়ে সন্তুষ্ট। নিজেদের আধিপত্য বহাল রাখা ও প্রতিরক্ষার জন্য তারা প্রত্যেকেই খৃস্টানদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এমনি পরিস্থিতির মধ্যে সুলতান আইয়ুবী বুজার ও মুমবাজের আমীরের কাছে দূত পাঠালেন। সুলতানের চিঠি নিয়ে বুজার আমীরের কাছে গেলেন ইয়াজুদ্দিন এবং মুমবাজের আমীরের কাছে সাইফুদ্দিনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন।

ফখরুদ্দিন বন্দী হওয়ার পর সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আনুগত্য স্বীকার করলেই সুলতান

তাকে বিশ্বস্ত মনে করবেন এবং তাকে নিজের অন্যতম সহকারী করে দূত হিসাবে বাইরে পাঠাবেন, এমনটি তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

আইয়ুবী তাকে নিজের বিশেষ দূত হিসেবে মুমবাজে প্রেরণ করেন। মুমবাজে পাঠানোর পূর্বে তিনি তাকে বললেন, 'আপনাকে আমি আমার প্রতিনিধি করে মুমবাজ পাঠাচ্ছি। আপনি কেল্লার আনুগত্য লাভের জন্য নিজের মত করে তাদের বুঝাবেন। তাদের আনুগত্য লাভের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে আপনি তাদের আশ্বস্ত করবেন। আপনার দেয়া ওয়াদার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা হবে।'

তিনি যখন একান্ত আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এসব কথা বলছিলেন, কখরুদ্দিন তখন অপার বিস্ময় নিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন বিশ্ব ইতিহাসের এক মহানায়ক সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে।

তার এ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি দেখে সুলতান আইয়ুবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এতো অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি কি মুসলমান নন? এক মুসলমান কি আরেক মুসলমানের ওপর এতটুকু আস্থা রাখতে পারে না?' তিনি আরো বললেন, 'আপনি আমাকে এমন বিস্ময় নিয়ে দেখছেন যেন আমি কোন অপরাধ করেছি। যেন আমি শত্রু বা বিধর্মীকে দূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু আমি তো আপনার শত্রুই! বন্দী হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

করেছি তো নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য! যখন বুঝতে পেরেছি, আপনার সাথে কুলিয়ে উঠার সাধ্য আর নেই আমাদের, আপনার আনুগত্য গ্রহণের মধ্যেই আমাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ, কেবল তখনই আপনার আনুগত্য কবুল করেছি! এরপরও আপনি আমাকে আপনার দূত করার যোগ্য মনে করছেন এবং সন্ধির শর্ত নির্ধারেণের স্বাধীনতা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। কারণ আপনাকে আমি বোকাও মনে করি না, অযোগ্যও ভাবি না। আর আপনার চাইতেও আপনাকে আমি বেশী বিশ্বাস করি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি মুমবাজের কেল্লার আনুগত্য চাই। আপনি সেখানে তার আমীরের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবেন ও বুঝাবেন যে, অযথা খুন-খারাবী থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এটাই একমাত্র পথ। ওরা আমাদের সাথে হাত মেলালে আমাদের সম্মিলিত শক্তি আরো জোরদার হবে এবং আমাদের বিজয়ের অংশীদার হবে তারা। তাই ওদেরকে বুঝাবেন, ওদের সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করে দিতে।'

তিনি আরো বললেন, 'আপনি একজন মুসলমান। এতদিন ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাঁধা দিয়ে নিজের ওপর যে জুলুম করেছেন, এই দায়িত্ব পালন করে তার কাফফারা আদায় করুন। আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, আপনিও নিজের ওপর আস্থা অর্জন করুন।'

ইয়াজুদ্দিন ও ফখরুদ্দিন উভয়েই নিজ নিজ মিশন নিয়ে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে গেল।

বুজার আমীর ইয়াজুদ্দিনকে সাদরে গ্রহণ করলো। ইয়াজুদ্দিন আদবের সাথে সুলতানের চিঠি পেশ করলো বুজার আমীরের নিকট। বুজার আমীর চিঠি খুলে পড়তে শুরু করলেন।
সুলতান আইয়ুবী লিখেছেন, 'আমার প্রিয় ভাই! আমরা এক আল্লাহ, এক রাসূল এবং একই কুরআনের অনুসারী। অথচ আমরা একে অপর থেকে এমন দূরে সরে পড়েছি, যেন আমরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। এতে আমরা পরস্পর কমজোর হয়ে পড়েছি।
এ অবস্থায় থাকলে জাতি হিসাবে কখনো আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো না। আমাদের এ অনৈক্যের সুযোগ নিচ্ছে খৃস্টান ক্রুসেডাররা। তারা আমাদের খণ্ড-বিখণ্ড করে শিয়াল ও শকুনের মত কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের। কারণ তারা আমাদের ঈমানী চেতনাকে অসাড় ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। আমরা যে একে অপরের ভাই এবং একই নবীর উম্মত, যাদের নবী শিশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছেন, সেই অনুভূতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।
এ অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন জিল্লতি ও অপমান আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। আমাদের মুক্তির পথ একটাই, এক দেহ এক প্রাণ হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরা। যেভাবে খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং আঘাত

হানছে, তাতে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে দেরী করি, তবে আমরা কেউ সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না।

আমি আপনাকে এই ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে আমরা এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের ঐক্যের ভিত্তি হবে কোরআন। কোন ব্যক্তি নয়, কোরআনই হবে আমাদের পরিচালিকা শক্তি। যার যার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা ভূমিকা রাখবো এ জেহাদে।

আমি আপনার বর্তমান অবস্থা ভালভাবেই অনুধাবন করছি। আপনি আপনার ক্ষুদ্র এলাকায় নিজের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য জাতীয় শত্রুদের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি আপনাকে কুরআনের সেই আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে বলা হয়েছে, অমুসলমান কখনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহর এ সুস্পষ্ট ঘোষণা অগ্রাহ্য করে খৃস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে তার ভয়াবহ পরিণতি গ্রাস করবে আমাদের।

তাই আপনার কাছে আমার পয়গাম হচ্ছে, প্রথমেই আপনি আপনার কেল্লাকে ইসলামী খেলাফতের অধীন করে দিন। খেলাফতের দাবী অনুযায়ী আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ আপনার সামরিক শক্তি আমাদের সামরিক শক্তির সাথে একাত্ম ও মিলিত করে দিন।

আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হলে আপনি অবশ্যই আপনার কেল্লার অধিপতি থাকবেন। কিন্তু কেল্লার ওপর উড্ডীন থাকবে খেলাফতে ইসলামিয়ার পতাকা।

প্রিয় ভাই,
যদি আমার এ শর্ত আপনার মনপুত না হয় তবে আপনার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করুন আমার বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার জন্য। তবে এ প্রস্তুতির সময় আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, হলব, মুশেল ও হারানের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা ও পলায়নের কথা স্মরণ রাখার জন্য। এতে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।
আমি দৃঢ় আশাবাদী, আমার পয়গাম অবশ্যই আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের আশা পোষণ করি। কারণ আপনার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আমি যা কিছু বলছি, সবই ইসলামী খেলাফতের কল্যাণের কথা চিন্তা করে অর্পিত দায়িত্বের কারণেই বলছি। আল্লাহর বিধান অনুসারে আমি যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে যেতে পারি সে জন্য আপনার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করে শেষ করছি।'
বুজার আমীর সুলতান আইয়ুবীর চিঠি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লেন এবং পড়া শেষ হলে ইয়াজুদ্দিনের দিকে তাকালেন।
'জ্বী, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এ চিঠি আমি গভীর মনোযোগের সাথেই পড়েছি। এ সম্পর্কে আপনার আর কিছু বলার আছে?'
ইয়াজুদ্দিন বললো, 'আপনার এ দুর্গ তেমন মজবুত নয় আর আপনার সৈন্য সংখ্যাও অনেক কম। এই সামান্য সংখ্যক

সৈন্যকে আপনি অযথা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন না, এটুকুই আমার অনুরোধ।'

বুজার আমীর চিঠির শর্ত মেনে নিয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন এবং সুলতান আইয়ুবীর নিকট জওয়াবী পত্র দিলেন। জওয়াবী চিঠিতে তিনি লিখলেন,

'মুহতারাম মহানুভব সুলতান,

এ দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে নিয়ে আপনি যেভাবে চিন্তা করছেন, তাতে আমি আশাবাদী, একদিন এ দুর্যোগের রাহুমুক্ত আমরা হবোই। আপনাকে আমি খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। আপনি আসুন এবং এ কেল্লার দায়িত্ব বুঝে নিন। জাতির এ দুর্দিনে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

মুমবাজের আমীরও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে অনুরূপ পত্র লিখলেন। ফখরুদ্দিন সে জওয়াবী চিঠি নিয়ে ফিরে এলেন কোহে সুলতানের ক্যাম্পে।

সুলতান আইয়ুবী নিজেই কেল্লা দু'টোতে গেলেন। কেল্লা দু'টোর সমস্ত সৈন্য এনে নিজের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করে দিলেন। নিজের সৈন্য বাহিনীর লোক নিয়োগ করলেন কেল্লা দু'টোতে। তারপর এ বিশাল বাহিনীর সৈন্যদের খাবার ও রসদপত্র মজুদ করার নির্দেশ দিলেন উভয় কেল্লায়।

কোহে সুলতানের সমস্ত রসদপত্র নিরাপদ স্থানে মজুদ করার পর পরবর্তী কাজে হাত দিলেন সুলতান। হলব শহরের একেবারে সন্নিকটে এজাজ দুর্গ নামে একটি মজবুত কেল্লা ছিল। সে দুর্গের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল হলববাসীদের। হলবের

মতই এ কেল্লার নিয়ন্ত্রণভার ছিল আল মালেকুস সালেহের হাতে।
এ কেল্লা থেকে হলব বেশী দূরে ছিল না বলেই এ কেল্লার রক্ষক কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে শুরুতেই হলবের আমীর আল মালেকুস সালেহের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল।
সুলতান আইয়ুবী হলব অবরোধ করার আগে এজাজ দুর্গটিও বিনা বাঁধায় দখল করে নিতে চাইলেন। এ আশায় তিনি তার এক সেনাপতি আল হেমায়েরীকে অনুরূপ চিঠি দিয়ে এজাজ দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।
এজাজের আমীর সুলতান আইয়ুবীর চিঠি পড়লেন। এ চিঠির ভাষাও আগের চিঠিগুলোর মতই ছিল। এজাজের আমীর চিঠিটি পড়ে আল হেমায়েরীর দিকে ছুঁড়ে মারল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'তোমার সুলতান আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়ে সারা দুনিয়ার বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁকে বলো, আগেও আপনি একবার হলব অবরোধ করেছিলেন। তাতে কতটুকু কি লাভ হয়েছিল সে হিসাব করে তিনি যেন এজাজ দুর্গ অবরোধ করতে আসেন।'
'আপনি কি মুসলমানদের হাতেই মুসলমানদের রক্ত বন্যা বইয়ে দিতে চান?' আল হেমায়েরী বললো, 'আপনি কি চান, মুসলমান নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাক, আর খৃস্টানরা আমাদের এ অবস্থা দেখে আনন্দ উৎসব করুক?'
'না, আমি এটা চাইতে যাবো কেন, এটা তো চায় তোমার সুলতান। আমি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে তিনি কি

আমার আনুগত্য কবুল করে নেবেন? শোন, এটা ধর্মীয় জেহাদ নয়, এটা হচ্ছে দুই শাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লড়াই। ক্ষমতা ও রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে তোমার সুলতান ধর্মকেই অপবিত্র করছে। আমরা কি মুসলমান নই? আমরা কি আল্লাহ ও তার রাসূলকে বিশ্বাস করি না? তাহলে তিনি কেন আমাদের ওপর চড়াও হতে চাচ্ছেন? এতই যদি জেহাদ করার শখ তাহলে তিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন না কেন? কারণ আমাদের মত তিনিও খৃস্টানদের ভয় পান। তার যত বাহাদুরী সব তো ছোট ছোট মুসলিম শাসক ও আমীরদের সামনে। এখানে যদি কোন মুসলমানের এক ফোটা রক্তও ঝরে, তার জন্য দায়ী থাকবেন তোমার সুলতান। তিনি হয়তো শক্তি প্রদর্শন করে কিছু ছোটখাট জায়গীর ও জমিদারী দখল করতে পারবেন, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তার সব দম্ভ ও জুলুমের হিসাব দিতে হবে। তোমার সুলতানকে বলো, এখানকার মুসলমানদের রক্ত ঝরানোর আগে তিনি যেন আল্লাহর পাকড়াওয়ের কথা একটু স্মরণ করে নেন!' এজাজের আমীর রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিল।

এজাজের আমীরের কথা শুনে সেনাপতি আল হেমায়েরী আস্তে করে বললো, 'আমাদের সুলতান আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন সেটা তিনিই ঠিক করবেন। কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন সেটা কি ঠিক করেছেন? কোরআন যেখানে ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধু না ভাবার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে আপনি ওদের বন্ধু বানিয়েছেন। এর কি জবাব দেবেন আপনি?

যেখানে খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে, সেখানে আপনি ওদের শত্রু না ভেবে বন্ধু ভাবেন কোন যুক্তিতে?' আল হেমায়েরী জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কি আপনি কোরআনকে অগ্রাহ্য করতে চান? আপনি কি সত্যি মনে করেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের শত্রু নয়, বন্ধু?'

'এখানে, এই সময়ে আমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকেই আমাদের শত্রু হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। খৃস্টান নয়, তিনিই আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন।' এজাজের আমীর বললো, 'যিনি এই দুর্গ আমাদের থেকে জোর করে কেড়ে নিতে চান, তাকে শত্রু না ভেবে যারা আমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের আমরা অযথা শত্রু ভাবতে যাবো কোন যুক্তিতে?'

আল হেমায়েরী ও এজাজের আমীরের মধ্যে এ রকম বাদানুবাদ আরো কিছুক্ষণ চললো। কিন্তু কিছুতেই এজাজের আমীরকে বুঝানো গেল না, সে জাতির কত বড় সর্বনাশ করছে। বরং সে দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল দরবার থেকে।

০

আছিয়াত দুর্গ। খৃস্টান অফিসার দেখা করলো গুমাস্তগীনের সাথে। কারিশমা এবং লিজাও তার সঙ্গে। গুমাস্তগীনের সাথে এ অফিসারের আগে থেকেই ভাল মতো পরিচয় ছিল। অফিসার গুমাস্তগীনকে বললো, 'শুনতে পেলাম আপনি সুলতান আইয়ুবীকে খুন করার পরিবর্তে সাইফুদ্দিনের পিছনে

লেগেছেন?'
'আপনি কি শোনেননি, সাইফুদ্দিন কেমন কাপুরুষের মত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে! এমন আনাড়ি যোদ্ধার মত খেলে সে আমাদের সবার মুখেই চুনকালি মেখে দিয়েছে।' গুমাস্তগীন বললো, 'তার কৃতিত্বের বর্ণনা এই মেয়ে দু'টির কাছ থেকে শুনে নিন। সে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীকে ময়দানে অসহায় ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে গেছে। তার অপরাধ শুধু এটুকুই নয়, সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, আমাদের বাহিনী দীর্ঘকাল আর যুদ্ধ করার মনোবলও জোগাড় করতে পারবে না। আমি বিচ্ছিন্ন সেনাদলকে একত্রিত করে সুলতান আইয়ুবীকে হলব থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবো। সাইফুদ্দিন বেঁচে থাকলে সে চাইবে না, তার পরিবর্তে আমি এ কৃতিত্ব অর্জন করি। সে তার কাপুরুষতা ঢাকার জন্য তলে তলে আমাকে পরাজিত করার চেষ্টা করবে। আর তা না হলে মনের আক্রোশ মিটানোর কথা বলে আরও একবার কমাণ্ডের জন্য জিদ ধরবে। আর এমনটি হলে আবারো আমাদের পরাজয়ের দুর্ভাগ্য বহন করতে হবে। তার চেয়ে বরং তাকে সরিয়ে দেয়াই ভালো।'
'সাইফুদ্দিন এত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি নয়, যেমন আপনি চিন্তা করছেন।' খৃস্টান অফিসার বললো, 'তার সম্পর্কে আমি যা জানি তা আপনি জানেন না। আমি আপনার প্রত্যেক বন্ধু ও প্রত্যেক শত্রু সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশী জানি। এ কাজের জন্যই আপনাদের কাছে আমাদের উপদেষ্টা ও গোয়েন্দারা সারাক্ষণ মজুদ থাকে।

আমার কথাই ধরুন, আমি সুলতান আইয়ুবীর এলাকায় বহুরূপী সেজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন? শুধু আপনাদের টিকে থাকা ও রাজ্য বিস্তারে সহায়তার জন্য। ময়দানের যে অবস্থা আমার জানা আছে, তাতে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আপনি বা আপনার কোন বন্ধু আইয়ুবীকে হারাতে পারবেন না। তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে হলে একমাত্র তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। নূরুদ্দিন জঙ্গী মারা গেছে, তাতে আপনারা এক আপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন। নূরুদ্দিন জঙ্গী গেছে বলেই আজ আপনারা সাধারণ কেল্লাধিপতি থেকে এলাকার শাসক হয়ে বসতে পেরেছেন। আইয়ুবী যদি মারা যায়, তাহলে আপনারা রাজ্যকে বর্ধিত করার সুযোগ পাবেন। ছোট ছোট পরগণার শাসক থেকে হয়ে যাবেন দেশের বাদশাহ। এসব কি ভেবে দেখেছেন?'

এ সময় কথা বলে উঠলো কারিশমা, 'আর আইয়ুবীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আপনারা চিরদিনের জন্য যুদ্ধের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে পারেন। আইয়ুবী বেঁচে থাকলে আপনাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হবে ভয় ও শংকার মধ্যে। একদিনের জন্যও সে আপনাদের শান্তি ও স্বস্তিতে ঘুমোতে দেবে না।'

গুমাস্তগীন শুনছিল ওদের কথা। খৃস্টান অফিসারটিই আবার কথা বলে উঠলো, 'আমি ত্রিপলী যাচ্ছি। আপনারা যে উট, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন সে ক্ষতি জলদি পূরণ করার জন্য আমি আমাদের নেতৃবৃন্দকে বলবো। আশা করি যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া আমরা শীঘ্রই পাঠিয়ে দিতে পারবো। আমি আপনাকে

বলতে চাই, আপনি কিছুতেই সাহস হারাবেন না। আপনার ওপর আমাদের নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট সু-ধারনা ও আস্থা রয়েছে। তারা এখন মনে করছেন, সুলতান আইয়ুবীকে একমাত্র আপনিই দুনিয়া থেকে সরাতে পারবেন। আর আপনি যদি সত্যি তা পারেন, তবে আপনাকে এত বেশী সাহায্য দেয়া হবে যে, আপনার শাসন ক্ষমতা সাইফুদ্দিন এবং আল মালেকুস সালেহের চাইতেও শক্তিশালী ও ব্যাপক হবে। চাই কি, মুসলমানদের কাছে সুলতান আইয়ুবী যে মর্যাদা ও সম্মান পাচ্ছে, সেই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন আপনি।'

গুমাস্তগীন ছিল যেমন বিলাসপ্রিয় ও ক্ষমতালোভী, তেমনি সুযোগ সন্ধানী। ক্ষমতার লোভ গুমাস্তগীনের ওপর এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, তার স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিও গ্রাস করে নিয়েছিল। খৃস্টান অফিসারের কথা শুনে তার মগজে একবারও এ চিন্তা জাগেনি যে, এই খৃস্টান অফিসার যা বলছে, তা গুমাস্তগীনের কল্যাণের জন্য নয়, বরং খৃস্টানদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই বলছে। সে সেই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলমানের নাম নিশানা মুছে দিতে চায়। সে যা কিছু বলছে ও করছে, সবই তার আপন জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই।

এ খৃস্টান অফিসারটি ছিল ভয়ংকর দুষ্কৃতকারী এবং অতিশয় দক্ষ ও চালাক ক্রুসেডার। কেমন করে সুলতান আইয়ুবীর ঝড়ের গতি থামাবে, এ নিয়ে সে ছিল খুব পেরেশান ও বিচলিত।

প্রত্যেক রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে খৃস্টান ক্রুসেডাররা এখন একটা কথাই শুধু ভাবছিল, সুলতান আইয়ুবীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আর এ কাজটি সারতে হবে কোন মুসলমানকে দিয়েই।

তারা ভাল করেই জানতো, মুসলমান শাসকদের পরষ্পরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ, তাতে সুলতান আইয়ুবীর পর এমন আর কেউ নেই যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিতে পারে। বরং আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধ শেষ হলে শুরু হবে যুদ্ধের নতুন পর্যায়। এক মুসলিম শাসক নিজের আধিপত্য বিস্তারের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্য শাসকের ওপর। তখন খৃস্টানদের কাজ হবে সংঘাতরত উভয় শক্তিকে অস্ত্র ও রসদ সম্ভার দিয়ে সহায়তা করা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সাহস ও উৎসাহ যুগিয়ে যাওয়া। এতে করে তারা পরস্পর যুদ্ধ করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুসলিম নিধনের যে স্বপ্ন তাদের অন্তরে অনুক্ষণ জ্বলছে, সে স্বপ্ন সফল করে দেবে মুসলমানরাই।

আর সফলভাবে যদি এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এরপর ক্রুসেডারদের সামনে আর বড় রকমের কোন বাঁধাই থাকবে না। তখন তারা ধীরে ধীরে সমস্ত আরব দেশগুলোর ওপর স্বচ্ছন্দে নিজেদের শাসন ক্ষমতা জারী করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তো তারা এতদিন ধরে মুসলিম আমীর ও শাসকদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে আসছে। তাদের মগজে জাগিয়েছে ধন-সম্পদের লোভ এবং বাদশাহী বা গদির

মোহ। এ এমন এক নেশা যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তাদের।

গুমাস্তগীনের সাথে কথা বলছিল, আর এ পরিকল্পনার কথা স্মরণ করছিল খৃস্টান অফিসার ও গোয়েন্দারা।

গুমাস্তগীন বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে শেখ মান্নান তো নিরাশ হয়ে গেছে। সে আরও চারজন ফেদাইন খুনী পাঠিয়েছে কিন্তু তারা যে সফল হবে এমন কোন আশা নেই তার।'

'এতগুলো হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর শেখ মান্নানের নিরাশ হওয়া ছাড়া আর কি করার আছে!' খৃস্টান অফিসারটি বললো, 'কিন্তু কেন তারা ব্যর্থ হয়েছে শেখ মান্নান না জানলেও আমি জানি। তার এতগুলো আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ফেদাইন গুপ্তঘাতকরা তাকে খুন করতে যেতো গাজায় দম দিয়ে। নেশার ঘোরে ওরা বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলতো। এসব নেশাখোররা কোনদিন তাকে হত্যা করতে পারবে না। তাকে হত্যা করতে পারবে সেই লোক, যে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারবে।'

কারিশমা আরেকটু আগ বাড়িয়ে বললো, 'কেবল সুস্থ মস্তিষ্কের হলেই চলবে না, আইয়ুবীকে হত্যার কঠিন সংকল্প থাকতে হবে তার। তাকে মনে রাখতে হবে, আইয়ুবী কেবল তার ব্যক্তিগত শত্রু নয়, জাতিরও শত্রু! সে এক জঘন্য খুনী। তার খায়েশ মিটাতে গিয়ে অসংখ্য মুসলমান আত্মাহুতি দিয়েছে। এই আবেগ থাকলেই কেবল তাকে হত্যা করা সম্ভব।'

'আপনি হয়ত মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ততটা জ্ঞাত নন।' বললো খৃষ্টান অফিসার, 'সুলতান আইয়ুবীকে যারাই খুনের পরিকল্পনা নিয়ে যায়, তাদের উপর নেশার ঘোর চেপে থাকে। যখন তাদের সামনে কোন বাঁধা আসে তখনই তাদের নেশার ঘোর কেটে যায়। তখন আক্রমণকারী তার জান বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে। এদের পরিবর্তে যদি আপনি হিংসার আবেগে ক্ষিপ্ত করে তাদের মনে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে হত্যার জন্য পাঠান, তবে সে অবশ্যই হত্যা করতে সক্ষম হবে।'

'শেখ মান্নান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যার জন্য চারজন কমাণ্ডো পাঠিয়ে দিয়েছে।' গুমাস্তগীন বললো, 'তারা কতদূর কি করতে পারে আগে দেখি। যদি তারা ব্যর্থ হয় তবে আমি নিজেই তাকে খুন করার জন্য যাবো। শেখ মান্নান আমাকেও চারজন কমাণ্ডো দিয়েছে। তবে তারা ফেদাইন দলের কেউ নয়, আইয়ুবীরই চার জানবাজ কমাণ্ডো। এদেরকে আমার কাছে দিয়ে বলেছে, এদের তৈরী করে সাইফুদ্দিনকে আগে হত্যা করো। কারণ এই কমাণ্ডো চারজন সাইফুদ্দিনকে শত্রু জানে। ফলে তারা তাকে হত্যা করে আনন্দ বোধ করবে। আমি তাদেরকে এ সুযোগ করে দেবো। সাইফুদ্দিনকে মৃত্যুর জালে ফেলানো আমার দায়িত্ব। তার অযোগ্যতা এবং আমাদের অপদস্ত করার শাস্তি হিসাবে এটাই তার পাওনা।'

'তার চেয়ে এদেরকে সুলতান আইয়ুবীর নিধনে প্রস্তুত করা হোক না কেন?' খৃষ্টান অফিসারটি বললো, 'এদেরকে নেশায় আচ্ছন্ন না করে এদের মনে ঘৃণার আক্রোশ জাগিয়ে তুলতে

পারলে এরা সহজেই আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারবে।'

'কিন্তু কিভাবে তাদের মনে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মানো সম্ভব? এরা তো আইয়ুবীরই লোক! শুনেছি, তার কমাণ্ডোরা তাকে অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা করে!' বললো গুমাস্তগীন।

এতক্ষণ পর এই প্রথম মুখ খুললো লিজা। বললো, 'দুনিয়াতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যদি আপনারা চান এ দায়িত্ব আমরা নিতে পারি। ওদের কমাণ্ডারের নাম আন নাসের। আমি ওদের এই কমাণ্ডারকে তৈরী করার দায়িত্ব নেবো। বাকী তিনজনকে সামলাবে কারিশমা।'

গুমাস্তগীনের দিকে তাকিয়ে খৃস্টান অফিসার সামান্য হাসলো। এরপর কারিশমা ও লিজার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'এদের আপনি চেনেন না, এরা লোক তৈরীর ক্ষেত্রে ওস্তাদ কারিগর।'

খৃস্টান অফিসার লিজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বেশ, তুমি আন নাসেরকে তৈরী করো। আর অন্যান্যদের দায়িত্ব কারিশমার ওপরই ছেড়ে দাও। মানুষকে বশ করার যাদু সে ভালই জানে। তার সাথীদেরকে সে একাই সামলাতে পারবে।'

কারিশমা মুচকি হাসলো শুধু, মুখে কিছু বললো না।

গুমাস্তগীন বললো, 'কিন্তু কিভাবে তোমরা এটা করবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করছি।' বললো খৃস্টান অফিসার। সে কারিশমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আন নাসের এখন কোথায়?'

'ওরা ফেদাইন প্রহরীদের হেফাজতে আছে।'

'তাকে এখানে নিয়ে এসো।' অফিসার বললো, 'আন

নাসেরকে এখন থেকে পৃথক কামরায় রাখবে, আর তার সাথীদের রাখবে অন্য কামরায়।' তারপর লিজাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আর তুমি খুব সাবধানে থাকবে। শেখ মান্নানের লালসার চোখ পড়েছে তোমার ওপর। সে সহজে তোমাকে ছাড়বে না। সে তোমার জন্য এতটা উতলা হয়ে পড়েছে যে, তোমার জন্য আমাকে পর্যন্ত চোখ রাঙানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে।'

গুমাস্তগীন অবাক হয়ে বললো, 'কি বললে! একটা মেয়ের জন্য সে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে?'

অফিসার বললো, 'তার কথা আর বলবেন না। আমাকে ধমক দিতেও বাঁধেনি তার। সে আমাকে এই বলে শাসিয়েছে, মেয়েটাকে আমার কাছে সঁপে দাও নইলে তুমি মেহমান থেকে কয়েদীতে পরিণত হবে। সে আমাকে খুন করার হুমকিও দিয়েছিল। আমি ধৈর্য না ধরলে এতক্ষণে খুনাখুনি কাণ্ড ঘটে যেতো। আমি 'চিন্তা করে দেখবো' বলে ওদের নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে এখন আর ওদের এখানে আনার দরকার নেই।' গুমাস্তগীন বললো, 'আমি চার কমাণ্ডোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। আপনিও এই দুই মেয়েকে নিয়ে একসাথে চলুন এখান থেকে বের হই। আমি এবং আপনি দু'জন এক সাথে থাকলে সে হয়তো বেশী বাড়াবাড়ি করার সাহস পাবে না।'

০

গুমাস্তগীনের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। আন নাসের ও তার তিন সঙ্গীকে ডেকে আনা হলো খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত কেল্লার বিশেষ এলাকায়। এখানে ক্রুসেডারদের মেহমান রাখার জন্য বিশেষ কামরার ব্যবস্থা আছে।
আন নাসেরকে পৃথক কামরা দেয়া হলো। কিন্তু বেঁকে বসলো আন নাসের। সে বললো, 'আমি আমার সাথীদের সাথে একত্রে থাকতে চাই। যদি আমরা বন্দী হয়ে থাকি তবে আমাদের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দাও। আর যদি বন্দী না হই তাহলে আমাদের একত্রে থাকতে দাও।'
এ কথা শুনে খৃস্টান অফিসার একটু অবাক হলো। সে চাচ্ছিল, কারিশমা ও লিজা আজ থেকেই তাদের মিশন শুরু করে দিক। কিন্তু এদের আলাদা করা না গেলে তো মিশন শুরু করা সম্ভব নয়! সে আন নাসেরকে বললো, 'একি বলছো তুমি! তুমি এদের কমাণ্ডার! আমি তোমাদের পৃথক হওয়ার কথা বলছি না, যখন ইচ্ছা তুমি ওদের কাছে যেতে পারবে, ওরা তোমার কাছে আসতে পারবে। আমি তো শুধু তোমাকে তোমার মর্যাদা অনুযায়ী থাকতে বলছি। কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মর্যাদা তো আর এক নয়, তাহলে তুমি আপত্তি করছো কেন?'
'আমাদের কাছে কোন উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই।' আন নাসের বললো, 'আমাদের সুলতানও তাঁর সৈন্যদের সাথে থাকেন। আমি তাঁর তুলনায় কিছুই না, সামান্য এক কমাণ্ডার মাত্র। আমি তাদের থেকে আলাদা হলেই বরং অস্বস্তি বোধ করবো। নিজের মধ্যে কখন গর্ব ও অহংকার এসে যায় এই ভয়ে আমার ঘুম

হবে না। এক অন্যায় ও পাপ বোধে জর্জরিত হবো শুধু।'

'আমরা তোমাকে সম্মান করতে চাই, তোমার উপযুক্ত মূল্য দিতে চাই। এটাই আমাদের রীতি।' খৃস্টান অফিসার বললো, 'তোমাদের ওখানে গিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করো, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের এখানে আছো ততক্ষণ তোমার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধাবোধ আছে তা বজায় রাখার জন্য আমাদের সহায়তা করবে, আমাদের রীতিকে শ্রদ্ধা করবে, এটুকু সৌজন্যও কি আমি তোমাদের কাছে আশা করতে পারি না?'

এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না আন নাসের। ওরা তো ওদের রীতি অনুযায়ী তাকে সম্মান দেখাতে চাইতেই পারে! এ ব্যাপারে তাদের আহত করা কি তার উচিত হবে? আবার ভাবছিল, এটা তো কোন ষড়যন্ত্রের অংশ নয়? দ্বিধা কম্পিত কণ্ঠে আন নাসের বললো, 'আমাদের কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডার তার সৈন্যদের সাথে একত্রে থেকেই জীবন কাটায়। এক সাথেই তারা জীবিত থাকে আর মরতে হলেও একত্রেই তারা মৃত্যু বরণ করে। যেদিন আমরা কমাণ্ডো বাহিনীতে নাম লিখিয়েছি, সেদিন থেকেই মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছি আমরা। আমরা বেঁচে আছি সেই আকাঙ্খিত মৃত্যুর প্রত্যাশায়।' আন নাসের বললো, 'মৃত্যু পথের যাত্রী হিসাবে আমরা কখনও একে অপর থেকে দূরে থাকতে চাই না।

তা ছাড়া, আমরা যদি আপনার এখানে মেহমান হিসাবে আসতাম, তবু না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু আমরা তো

এখানে এসেছি কয়েদী হিসাবে। আপনি ভাল করেই জানেন, আমরা আপনাদের দুশমন। আর দুশমনকে কেউ কখনো মেহমানের মত আদর আপ্যায়ন করে না।'

আন নাসের ওদের আরো বললো, 'আমরা জানি, আমরা আপনাদের বন্দী! আর বন্দীদের ভাগ্য তো শুধু একটাই হতে পারে, ক্রমাগত শাস্তি ভোগ করা এবং একের পর এক বিপদ মুসীবত ও কষ্ট সহ্য করে যাওয়া। আমরা এসব কষ্ট ও যন্ত্রণা মিলিতভাবেই বরণ করে নিতে চাই। আমরা একই মঞ্জিলের মুসাফির। বাঁচলে আমরা এক সাথেই বাঁচতে চাই, মরলেও একই সাথে জীবন কুরবানী করতে চাই।'

আন নাসেরের এ বক্তব্যের পর আর কথা চলে না। খৃস্টান অফিসার হাল ছেড়ে দিল। গুমাস্তগীনকে জানানো হলো আন নাসেরের বক্তব্য। শুনে গুমাস্তগীন বললো, 'চলো তো, ওদের দেখে আসি!'

সে রাতেই গুমাস্তগীন খৃস্টান অফিসারের সাথে ওদের কাছে এলো। আন নাসেরের বক্তব্যের জবাবে বললো, 'তবে কি তোমরা আমার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করবে?'

আন নাসের হেসে বললো, 'আমরা মুক্ত হতে তো অবশ্যই চেষ্টা করবো। এটাই তো আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। আমরা যোদ্ধা! বীরের মত মরতে পারলেও আমরা খুশী। আমাদেরকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে না দিলে বীরের মত মরতে দাও, আর যদি তা না করে বন্দী করে রাখতে চাও, তবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। আমাদের সঙ্গে কোন প্রতারণা করবে না।

প্রতারণা আমরা একদম পছন্দ করি না। আমি আবারও বলছি, আমরা রণাঙ্গণের সৈনিক। আমরা সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনের মত গাদ্দার ও ঈমান বিক্রেতা নই।'

'খামোশ!' রাগে গর্জন করে উঠল গুমাস্তগীন, 'আমি হাররানের স্বাধীন শাসক আমীর গুমাস্তগীন! তুমি আমাকে গাদ্দার ও ঈমান বিক্রেতা বললে!'

'আমি আপনাকে আরও একবার গাদ্দার এবং ঈমান বিক্রেতা বলছি।' আন নাসের বললো, 'আপনি অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক, মুসলিম জাতির কলঙ্ক এবং ইসলামের দুশমন।'

চতুর গুমাস্তগীন এরই মধ্যে সামলে নিয়েছে নিজেকে। রাগ সামলে সে বলে উঠল, 'কিন্তু এখন আমি বেঈমানও নই, বিশ্বাসঘাতকও নই।' গুমাস্তগীন আন নাসেরকে নরম সুরে বললো, 'দেখো না, তুর্কমানে যুদ্ধ চলছে, আর আমি এখানে বসে আছি। যদি আমি তোমাদের শত্রুই হতাম তবে আমি অবশ্যই এখন ময়দানে থাকতাম। যদি তোমাদের দুশমন ভাবতাম, তবে তোমাদেরকে এমনভাবে মুক্ত রাখতাম না। আমি সাইফুদ্দিন ও আল মালেকুস সালেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছি। ওদের সাথে এখন আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি ঠিকই বলেছো, একদিন গুমাস্তগীন বিশ্বাসঘাতকই ছিল, কিন্তু সে গুমাস্তগীন মরে গেছে। এখন যে তোমাদের সাথে কথা বলছে, সে এক আলাদা গুমাস্তগীন। ভুল তো মানুষই করে! ভুলের কি কোন প্রায়শ্চিত্য নেই? আমি আমার ভুলের কাফফারা দিতে চাই। এ জন্যই তোমাদেরকে সম্মান ও

শান্তিতে এই দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই। আল্লাহ বান্দার জন্য তওবার দুয়ার খুলে রেখেছেন। তোমরা কি বলতে চাও আমার জন্য সে দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে? আমি তা বিশ্বাস করি না। আল্লাহ যে দুয়ার খুলে রেখেছেন, তা তোমরা বন্ধ করতে পারো না। আমার সাথে চলো। ফেদাইনদের খপ্পর থেকে আগে তোমাদের বের করে নেই, তারপর তোমাদের সম্মানের সাথে বিদায়ের ব্যবস্থা করবো। তুমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক কমাণ্ডার! সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বুকে যে মহানুভবতা, দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা আছে, ততটুকু না হোক, সেই চেতনা ও আবেগেই তো তোমাদের হৃদয়ও পূর্ণ থাকার কথা!'

গুমাস্তগীন তার দীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ বক্তব্য শেষ করলো। আন নাসের বললো, 'কিন্তু কিছুতেই আমি আমার সঙ্গীদের থেকে পৃথক থাকবো না। আপনি যা বললেন, এই যদি হয় আপনার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি; তবে আমাদের একত্রে থাকার এ সামান্য আবেদনটুকু আর অগ্রাহ্য করবেন না।'

'না, তা করবো কেন?' গুমাস্তগীন বললো, 'যেভাবে থাকতে তুমি পছন্দ করবে, সেভাবেই থাকবে তুমি। তোমাকে আলাদা কামরায় থাকতে হবে না, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথেই থাকো।'

তার সাথীরা একটি আরামদায়ক খোলামেলা কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কামরাটি ছিল সুন্দর ও সুসজ্জিত। সেখানে নরম খাটের ওপর নরম ও মোটা বিছানা পাতা ছিল। তাদের

সেবায় নিয়োজিত ছিল একাধিক খাদেম। তারা চাকরকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই কামরা এত সুসজ্জিত কেন? এখানে কারা থাকে?'

চাকর বললো, 'এটা কেল্লার খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত অংশ। সাধারণত এখানে খৃস্টান ও তাদের মেহমানরা থাকে। কামরাটি সুসজ্জিত এ জন্য যে, এখানে শুধু সেইসব মেহমানরাই থাকে, যারা উচ্চ মর্যাদার ও সম্মানিত লোক।'

তিন কমাণ্ডো লক্ষ্য করে দেখলো, তাদের ব্যবহার কয়েদীদের সাথে ব্যবহারের মত নয়।

কমাণ্ডোরা খুবই ক্লান্ত ছিল। খাওয়ার পর এমন আরামপ্রিয় বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম এসে জড়িয়ে ধরলো তাদের। শুয়ে শুয়ে তারা ভাবছিল আন নাসেরের কথা। কিন্তু কখন যে ঘুম এসে ওদের কাবু করলো, টের পেলো না কেউ। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়লো তিন কমাণ্ডো।

০

এখন গভীর রাত। চারদিকে রাতের আঁধার ও নিস্তব্ধতা। কেল্লার কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় বাতি জ্বলছে। তার আলোয় আশপাশের সামান্য অংশই আলোকিত। ঘন এবং চাপ চাপ অন্ধকার কেল্লার সবখানে। আকাশে চাঁদ নেই। তারার আলোও নিস্প্রভ। সম্ভবত হালকা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে তারকারাজি।

আন নাসের খৃস্টান অফিসারের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো।

খৃস্টান অফিসার এবং গুমাস্তগীন অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত তার দাবী মেনে নিয়েছে, এ জন্য খুশী আন নাসের। বন্ধুদের কামরার দিকে হাঁটা দিল সে।

বারান্দা ধরে হাঁটছে আন নাসের, মেয়েলি কণ্ঠের একটি ভূতুড়ে ডাকে থমকে দাঁড়ালো সে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কে ডাকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না।

খৃস্টান অফিসার এবং গুমাস্তগীনের আচরণ তাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। এরা যদি তার সাথে শত্রুর মত নির্দয় আচরণ করতো তবে তা সে সহজভাবেই মেনে নিতে পারতো। কিন্তু বন্দীর সাথে এটা কোন্ ধরনের ব্যবহার! গুমাস্তগীনের মত দাম্ভিক ব্যক্তিটি কি আসলেই ভাল হয়ে গেছে! সে যে যুদ্ধে যায়নি এটা তো পরিষ্কার। তার সাথে তারা এমন সম্মানজনক আচরণ করলো ও এমনভাবে কথা বললো, যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না আন নাসের।

আন নাসের কামরা থেকে বেরোনোর আগেই লিজা ও কারিশমা বেরিয়ে গিয়েছিল কামরা থেকে। আন নাসের যখন কামরা থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে ধীর পদে হেঁটে যাচ্ছিল, মেয়েলি কণ্ঠের ছোট্ট একটি ডাক আবার তাকে থামিয়ে দিল। বারান্দার এ অংশটা ডুবে ছিল অন্ধকারে, আন নাসের থামতেই একটি কালো ছায়া তার সামনে এগিয়ে এলো। ছায়াটি লিজার। সে এসে আন নাসেরের বাহু চেপে ধরে বললো, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হয়েছে, আমি পরী নই, নির্ভেজাল এক মানব কন্যা?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আমাদের নিয়ে এসব কি হচ্ছে?' আন নাসের রুষ্ঠ কণ্ঠে বললো, 'আমি একজন কয়েদী, অথচ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন আমি কোন রাজপুত্তুর!'

'এতে তোমার অবাক হওয়ার কিছু নেই।' লিজা বললো, 'একটু বুঝার চেষ্টা করো, মাথা খাটাও, সব তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। গুমাস্তগীন তো তোমাকে বলেই দিয়েছে, তিনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে শত্রুতা বাদ দিয়েছেন। এখন তিনি আইয়ুবীর কোন সৈন্যকে আর যুদ্ধবন্দী মনে করেন না। তুমি এবং তোমার সঙ্গীদের বড় সৌভাগ্য যে, তোমরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলে, আর একই সাথে গুমাস্তগীনও এখানে এসে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় কারণটি আমার একান্ত নিজস্ব, বলতে পারো ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি আমার মর্যাদা ও পরিচয় কিছুই জানো না। আমি তোমার দৃষ্টিতে একজন নষ্টা মেয়ে বৈ কিছু নই। ধনী আমীর ও সামরিক অফিসারদের বিলাসিতার উপকরণ মাত্র। যদি তুমি এটাই ভেবে থাকো, তাহলে বলবো, তুমি মিথ্যা ধারণা ও সন্দেহের রাজ্যে বসবাস করছো!'

লিজা তার বাহু টেনে ধরে বললো, 'এসো, এটা কথা বলার মত উপযুক্ত জায়গা নয়। সব কিছু জানতে হলে চলো কোন গোপন জায়গায় নিরিবিলিতে গিয়ে বসি।'

লিজা তাকে টানতে টানতে বারান্দা থেকে নামিয়ে বাগানে নিয়ে গেল। বাগানের এক কোণে বসতে বসতে বললো, 'এখানে

মাথা ঠাণ্ডা করে বসো। দেখি তোমার সন্দেহ দূর করা যায় কিনা।'

'মাথা তো আমার কখনোই গরম ছিল না।' বসতে বসতে বললো আন নাসের, 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি যে এখন মুক্ত স্বাধীন, এটা তো বুঝতে পেরেছো! নইলে এই গভীর রাতে কারাগারের পরিবর্তে এক যুবতীকে নিয়ে বাগানের অন্ধকারে বসে থাকতে পারতে না, এটা বোঝ?'

'হ্যাঁ, এটুকু বুঝতে পারছি।'

'তাহলে এবার বলো, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? আমি কি জ্বীন না মানুষ? আমার সম্পর্কে তোমার মন্তব্য আগে শুনে নেই, তারপর সবই তোমাকে খুলে বলবো।'

দুর্গের এ অংশটি ছিল একটি বাগান। চারপাশে ফুলের গাছ, মাঝখানে খোলা মাঠ। মাঠের মাঝে ফাঁকা জায়গায় বড় বড় পাথর দিয়ে বসার আসন তৈরী করা হয়েছে। তারই একটিতে বসলো ওরা। বিকেলে এখানে বেড়াতে আসে কেল্লায় আগত মেহমান ও অফিসাররা। সন্ধ্যার পরও হয়তো কিছুক্ষণ থাকে, কিন্তু এখন এই গভীর রাতে বাগানে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

আন নাসের আশপাশে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল বাগানটি কেমন পরিপাটি। বিচিত্র ফুলের সৌরভ ভেসে আসছিল তার নাকে, কিন্তু অন্ধকারের জন্য কোথায় কি গাছ আছে বুঝা যাচ্ছিল না।

আন নাসের দৃষ্টি প্রসারিত করে দূরে তাকালো। দুর্গের প্রাসাদগুলোর বিন্যাস দেখে বুঝতে পারল, দুর্গটি বেশ বড় এবং দুর্গটি লম্বাটে ধরনের।

লিজা আন নাসেরকে প্রাসাদ থেকে বের করে যেখানে নিয়ে এসেছে, সে জায়গাটি খুবই মনোরম। ওরা পাথরের ওপর বসে যখন আলাপ করছিল, আন নাসের ধরেই নিয়েছিল, কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না, তাদের এ আলাপও কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু প্রাসাদের বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বহু দূর থেকেও ওদের দেখতে পাচ্ছিল খৃস্টান অফিসার এবং কারিশমা। কারিশমা বারান্দার এক পিলারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে।

'লিজা কি তাকে তার যাদুর ফাঁদে ফেলতে পারবে!' খৃস্টান অফিসার শঙ্কিত কণ্ঠে বললো।

'হ্যাঁ, লিজা খুব আবেগী মেয়ে।' কারিশমা বললো, 'ভাবছি, ভাব করতে গিয়ে সে তার মূল দায়িত্বই না ভুলে যায়!'

'আসলে এতো অল্প বয়সে তাকে এ ধরনের জটিল ডিউটিতে পাঠানো উচিত হয়নি আমাদের।' খৃস্টান অফিসারের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

'আরে, এতো ঘাবড়ানোর কি আছে! আমরা তার সঙ্গে আছি না! আর সেও একেবারে কচি খুকী তো নয়, আশা করি ঠিকই সামলে নিতে পারবে। যদি কুলিয়ে উঠতে না পারে, আমি তো আছিই।'

ওরা যখন এসব বলাবলি করছিল, লিজা তখন আন নাসেরকে বলছিল, 'তুমি তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে, আমি তোমার প্রতি কেন এত সদয় হয়েছি। তুমি তো তখন আমাকে শত্রু ভেবেই একথা জিজ্ঞেস করছিলে। আচ্ছা, তুমিই বলো তো, তোমার আমার মাঝে কিসের শত্রুতা? শত্রুতা তো তোমার ও আমার সুলতান ও সম্রাটের ব্যাপার। তাদের সে শত্রুতা তোমার ও আমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে কেন?'

'আর বন্ধুত্বই বা কেমন করে হবে, যেখানে আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্য?' আন নাসের জিজ্ঞেস করলো।

'সেটা তো লড়াইয়ের ময়দানের ব্যাপার! আচ্ছা, এটা কি কোন যুদ্ধের মাঠ, নাকি এখানে এখন কোন সংঘাত চলছে? এই নিস্তব্ধ রাত, এই শীতল হাওয়া, এই ফুলের সুবাস, এই নির্জনতা, এরা কি যুদ্ধের কথা বলে, নাকি প্রেমের বারতা বয়ে আনে?'

'প্রেমের বারতা তো প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য, আমরা তো যোদ্ধা, আমরা কমাণ্ডো সৈনিক। প্রেমের ভাবালুতায় মজে যাওয়ার সময় কোথায় আমাদের?'

লিজা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাস যেন আন নাসেরকে স্পর্শ করে গেল। লিজা তার কোমল বাহু আন নাসেরের কাঁধে রেখে বললো, 'তুমি কি সত্যি এক কঠিন পাথর? আমি শুনেছিলাম, মুসলমানের মন রেশমের মত নরম ও কোমল। ধর্ম বিষয়টা কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে তুমি কি নিজেকে এবং আমাকে মানুষ ভাবতে পারো না? তুমি

মুসলমান আর আমি খৃস্টান, এটা তো পরের ব্যাপার, পৃথিবীতে আমরা তো এসেছি মানুষ হিসাবে! সেই মনুষত্বের কি কোন মূল্য নেই? আমাদের উভয়ের বুকের মধ্যে আল্লাহ যে একটা কোমল মন দিয়েছেন, তাকে কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? চোখ বন্ধ করে একটু হৃদয়ের হাহাকার শোন। উপরের আবরণ সরিয়ে অন্তরের অন্তস্থলে যে সুরের মূর্ছনা বাজছে, কান পেতে শোন সে আওয়াজ। নিজের আত্মাকে জিজ্ঞেস করো, সে কি চায়? চারদিক থেকে একটি ধ্বনিই কেবল শুনতে পাবে তুমি, 'ভালবাসা, ভালবাসা'। এই ভালবাসাকে যে অস্বীকার করে, সে মানুষ নয়। হয় সে ফেরেশতা, নয়তো শয়তান। জানি না তুমি এর কোনটি।'

'দেখো লিজা! আমি ফেরেশতাও নই, শয়তানও নই। আর দশজন রক্তমাংসের মানুষের মত আমিও মানুষ। কিন্তু আমার যেমন আত্মা আছে তেমনি বিবেকও আছে। আত্মা আমার কাছে অনেক কিছুই চায়, কিন্তু আমি ততটুকুই তাকে দেই, যতটুকু বিবেক অনুমোদন করে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি জানো? পশু আত্মার গোলামী করে আর মানুষ বিবেকের হুকুম মতো চলে। তুমি কি তোমার বিবেককে অস্বীকার করতে চাও? তুমি কি বলতে চাও, তোমার মধ্যে বিবেক বলে কিছু নেই?'

'হয়তো আছে, হয়তো নেই!' লিজা উদাস কণ্ঠে বললো, 'তুমি পুরুষ মানুষ! তুমি তোমার মনকে বাঁধতে পারো। কিন্তু আমি যে এক অবলা নারী! আমার তো সে শক্তি ও সাহস নেই, যা

দিয়ে আমি বশ করবো আমার চিত্তকে। আমি আমার অন্তরের হাহাকার শুনবো, তার বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হবো। আমার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত চিত্ত দেখে আমার দুর্বল মন ছন্নছাড়া হয়ে যাবে, এইতো আমাদের নিয়তি! আচ্ছা, বলতে পারো নিয়তি এত নিষ্ঠুর কেন?'

'নিয়তিকে অযথা দোষারোপ করছো কেন, সে তো আমাদের দু'জনকে দুই আলাদা ঠিকানা ঠিক করে দিয়েছে, যাতে বেদনার তীর পরস্পরকে বিদ্ধ করতে না পারে!'

'না, ভুল বললে তুমি। দু'দিন আগেও আন নাসের বলে কাউকে চিনতাম না আমি। নিয়তিই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। তোমাকে দেখে আমার চোখে নতুন স্বপ্নের বীজও বুনেছে নিয়তিই। আমার মনের ভেতর তোমার যে ছবি অক্ষয় হয়ে আছে, সে ছবি কে এঁকে দিয়েছে আমার মনে? এটাও নিয়তিরই কাজ। আমার মনের মনিকোঠায় তোমার যে ছবি খোদাই করা হয়েছে, পৃথিবী উল্টে গেলেও সেখান থেকে কেউ কোন দিন তা সরাতে পারবে না।'

'লিজা, এসব কথা বলে আমাকে তুমি পটাতে পারবে না। ট্রেনিং দেয়ার সময়ই এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান করা হয়েছে। তোমাদের পাতা ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য বার বার সতর্ক করা হয়েছে আমাদের অতএব আমার পেছনে সময় ব্যয় না করে তুমি অন্য কাজে মন দিতে পারো।'

'কি! আমাকে তুমি তাদের দলে ফেলতে চাও, যারা প্রতারক, ধোঁকাবাজ! তোমার বিশ্বাস, ভালবাসার কথা বলে আমি

তোমাকে ফাঁদে জড়াতে চাইছি? কিন্তু না, এটা তোমার ভুল ধারনা।'

লিজা কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'তাহলে শোন, আমি তোমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই দুর্গে নিয়ে এসেছিলাম। শেখ মান্নান তোমাদের চারজনকেই কারাগারের গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দী করার হুকুম দিয়েছিল। যদি তোমাদেরকে সেখানে সত্যি বন্দী করা হতো, তবে তোমাদের লাশ ছাড়া আর কিছুই সেখান থেকে বের হতো না। আমি তোমাদের এই পরিণতির কথা স্মরণ করে শিউরে উঠলাম। শেখ মান্নানকে বললাম, এরা তোমার কয়েদী নয়, আমাদের শিকার। এরা আমাদের হেফাজতেই থাকবে। এই নিয়ে ওর সাথে আমাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়। সে শর্ত আরোপ করে বলে, 'যদি তুমি এই বন্দীদেরকে কয়েদখানার জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাও, তবে এক শর্তে আমি তা মেনে নিতে পারি, তুমি আমার স্বপ্নপুরীতে এসে আমার আশা পূরণ করবে।' কিন্তু শেখ মান্নানের মত জঘন্য খুনীকে আমি ঘৃণা করি। তার মত এক বুড়োর কুৎসিত আহবান প্রত্যাখ্যান করে আমি বলি, 'এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।' শেখ মান্নানও তার শর্তে নাছোড়। বললো, 'ঠিক আছে, এই চার কমাণ্ডো কারাগারে থাকবে নাকি তুমি আমার স্বপ্নপুরীতে আসবে, এটা তুমিই ফায়সালা করো। এ শর্তের কোন নড়চড় হবে না।'

কারিশমা আমাদের ঝগড়া থামাতে অনেক চেষ্টা করেছে। সে একবার শেখ মান্নানকে বুঝায়, একবার আমাকে। কিন্তু আমরা

উভয়েই যার যার সিদ্ধান্তে অটল থাকি। তখন কারিশমা আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বললো, 'লিজা, এটা শেখ মান্নানের দুর্গ। আমাদের মত দুই মেয়ে তার সাথে লাগালাগি করে কখনো পারবো না। তুই যদি শেখ মান্নানের কাছে নাও যাস, আপাতত তুই তার শর্ত মেনে নে। তারপর কি করা যায় আমি দেখবো।'

আমার তখন জিদ চেপে গেছে। যে করেই হোক তোমাদের আমি মুক্ত রাখার অটল সিদ্ধান্ত নিলাম। কেন যেন আমার তখন মনে হচ্ছিল, যুগ যুগ ধরে তুমি আমার পরিচিত। আমি যেন তোমাকে আজ থেকে নয়, সেই ছোট বেলা থেকেই ভালবেসে এসেছি। শুধু তোমার জন্যই আমার এ দেহ ও মন এত যত্ন করে গড়ে তুলেছি। আমি শেখ মান্নানের শর্ত মেনে নিয়ে তোমাদের মুক্ত করে নিলাম।'

'তুমি কি তোমার সম্ভ্রম ও ইজ্জত কুরবানী করে দিয়েছ?' আন নাসের উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো।

'না!' লিজা বললো, 'আমি শুধু তাকে ওয়াদা দিয়েছি। বলেছি, দু'দিন সময় দাও, আমার শরীরটা এখন ভাল নেই। শরীর ঠিক হলেই তোমার ডাকে আমি সাড়া দেবো। এই বলে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি।'

'তুমি খুব বেশী ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছো লিজা। শেখ মান্নান মানুষ নয়।'

'জানি, কিন্তু সে আমার আশ্বাসেই খুশী। আমার সম্মতি শুনে সে খুশীতে ডগমগ হয়ে বলেছে, 'ঠিক আছে, ভাল হওয়ার

আগ পর্যন্ত যত খুশী কেল্লার ভেতর মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে ফিরে বেড়াও, ভাল হলেই চলে আসবে আমার কাছে।'

আন নাসের বললো, 'ঠিক আছে, তুমি চাইলে আমি তোমার ইজ্জত ও সম্ভ্রমের হেফাজত করবো।'

'আমি কি তাহলে ধরে নেবো, তুমি আমার ভালবাসাও গ্রহণ করেছো?' লিজা তার ডাগর দু'চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো আন নাসেরকে।

আন নাসের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে তখন ভাবছিল তার প্রশিক্ষণকালীন শিক্ষার কথা। ট্রেনিং দেয়ার সময় তাদের বার বার সাবধান করে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েদের থেকে সব সময় দূরে থাকবে। তারা তাদের রূপ ও যৌবনের পসরা নিয়ে তোমাদের সম্মোহিত করতে চাইবে। ভালবাসার নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতে জালে আটকাতে চেষ্টা করবে তোমাদের।

কিন্তু সে সাবধানতা মুখের ভাষা ও কিছু উপদেশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এসব মেয়েদের ফাঁদ কত ভয়ংকর এবং জাল কত শক্ত হতে পারে, এ সম্পর্কে কোন বাস্তব ধারনা ছিল না আন নাসেরের। আন নাসের ও তার সঙ্গীরা নারীর চাক্ষুষ হামলার শিকার হয়নি কোনদিন। ফলে সতর্কতা সত্ত্বেও এমন হামলা থেকে বাঁচার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ট্রেনিং তারা পায়নি।

এখন যখন এক খৃস্টান মেয়ে তাকে এই ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত করছিল, তখন মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতার শিকার হতে লাগলো আন নাসের। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমে দুর্বল থেকে

দুর্বলতর হতে লাগলো, সেখানে প্রভাব ফেলতে লাগলো বিভ্রান্তির মোহ। সে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে এবং কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে অভ্যস্ত! ভয়-ভীতি কখনো তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিন্তু এখনকার দ্বন্দ্ব তো তার প্রজ্ঞার সাথে আবেগের। প্রজ্ঞাকে সজাগ ও সচল রাখতে হয় সক্রিয় চেতনার মাধ্যমে আর আবেগ পরিবেশের হাতে পড়ে আপনাতেই চেপে বসে মানুষের মনের গোপন তন্ত্রীতে। একটির জন্য দরকার সচেতন কর্মপ্রয়াস অন্যটির জন্য দরকার এই প্রয়াসের সামান্য নিষ্ক্রিয়তা। ফলে সচেতন না থাকলে সহজেই মানুষ আবেগ-বন্দী হয়ে পড়ে। আন নাসের সেই নিষ্ক্রিয়তারই শিকার হতে লাগলো।

সে লিজার মত এমন আকর্ষণীয় ও সুন্দরী মেয়ে জীবনে কখনও দেখেনি। প্রথম যখন সে লিজাকে দেখেছিল, তখন তার সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলেও সেই সৌন্দর্যের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি তার। কিন্তু এখনকার পরিবেশ ভিন্ন। লিজার রেশমের মত কোমল চুল কখনও তার গাল, কখনও বাহু স্পর্শ করছিল। সেই স্পর্শ তার অস্তিত্বে জাগিয়ে তুলছিল এক অনাস্বাদিত শিহরণ। সেই শিহরণে বার বার তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

তার জীবনে এমন ঘটনাও ঘটেছে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর কয়েক বারই তার দেহকে স্পর্শ করে চলে গেছে। বর্শার আঘাতে তার শরীরের চামড়া ছিঁড়ে গেছে, তবুও সেদিকে সে খেয়াল করেনি, এমনকি ভীতও হয়নি। তীর ও বর্শার আঘাত তার মনে কোনই

কম্পন জাগাতে পারেনি। মৃত্যুও কয়েকবার তার সামনে দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু তাকে ভড়কে দিতে পারেনি। সে আগুন নিয়ে খেলেছে। দুশমনের রসদ ভাণ্ডারে আগুন দিয়ে সেই অগ্নিশিখার ভেতর থেকে সে হাসতে হাসতে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। সেই বীর আজ নতুন এক আক্রমণের শিকার। কি করে এই আক্রমণের মোকাবেলা করবে, তা তার জানা নেই। অবস্থা এখন এমন যে, সে যে আক্রান্ত এই অনুভূতিও যেন সে হারিয়ে ফেলছে।

সামান্য এক অবলা মেয়ের চুলের সৌরভ ও তার কণ্ঠের যাদু আন নাসেরের মধ্যে যেন ভূ-কম্পনের মত কাঁপন সৃষ্টি করলো। সেই কাঁপন যেন তাকে অবশ করে ফেললো। সেই আবেশ বিহ্বলতার কারণে এই মেয়ের মাদকতাময় প্রলোভন থেকে বাঁচার চেষ্টা বাদ দিল আন নাসের। তীর ও বর্শার আঘাত থেকে বাঁচার যেমন চেষ্টা ছিল তার, তেমন কোন চেষ্টা করলো না সে, এমনকি চেষ্টা যে করতে হবে এই কথাও যেন সে ভুলে গেল।

লিজা তার যতই কাছে সরে আসছিল, এই আচ্ছন্নতা ততই তাকে আরও তীব্রভাবে গ্রাস করছিল। এক সময় আন নাসেরের মনে হলো, লিজাকে নিবিড় করে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন বা ইচ্ছে তার মধ্যেও জেগে উঠছে।

লিজা ছিল ট্রেনিং পাওয়া যুবতী। কেমন করে শিকারীকে বশীভূত করতে হয় তার সব ছলাকলাই জানা ছিল তার। সে তার এতদিনের শেখা বিদ্যা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখছিল।

আন নাসেরের হৃদয়ে আকাঙ্খার পিপাসা জাগলো। এ এমন এক পিপাসা, মরুভূমির পিপাসার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এ পিপাসার ধরন ভিন্ন, পিপাসা নিবৃত্তির পদ্ধতিও ভিন্ন। পানি দিয়ে সে পিপাসাকে নিবৃত্ত করা যায় না।

রাত যতই বেড়ে চললো, আন নাসের হারিয়ে যেতে লাগলো লিজার ভুবনে। প্রথম তার দেহ কাঁপলো, পরে তার ঈমান কাঁপলো, তারপর আবেগের স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো অজানা স্বপ্নের রাজ্যে।

'হ্যাঁ!' আন নাসের আবেগ মথিত স্বরে বললো, 'আমি তোমার ভালবাসা গ্রহণ করে নিলাম। কিন্তু এর পরিণাম কি হবে জানি না।'

'নাসের! পরিণামের কথা আমিই কি জানি! তোমার সাথে এভাবে দেখা হবে, তোমাকে দেখেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবো তোমার মধ্যে, দু'দিন আগেও কি আমি তা জানতাম? তোমার আমার ধর্ম আলাদা, জগত আলাদা, অথচ সে সব অবলীলায় তুচ্ছ করে আমরা দু'জন একাকার হয়ে যাবো, কে জানতো এ কথা?'

অন্ধকারের মাঝেও তারার আবছা আলোয় ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আন নাসেরের হৃদয় তোলপাড় করছিল নানা রকম জটিল দ্বন্দ্বে। সে লিজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আমার ধর্ম ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলবে? তুমি কি এখন আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বলবে?'

'না, আমি এমন কোন সিদ্ধান্ত তোমার ওপর চাপিয়ে দেয়ার কথা কখনো ভাবিনি।' লিজা বললো, 'যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, যাবে। আর যদি আমাকে জীবনের মত সঙ্গিনী করে তোমার সাথে নিয়ে যেতে চাও, আমি খুশী মনে তোমার হাত ধরে পথে নামতে রাজি। ধর্মকর্ম আমি কখনো তেমন একটা করিনি। যদি তুমি চাও, ধর্ম ত্যাগ করতেও আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার জন্য যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী করতে আমি প্রস্তুত। আমার পবিত্র ভালবাসার কসম, ভালবাসা ছাড়া তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না। আমার নিষ্কলুষ প্রেম পার্থিব চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে। তুমি যেমন আমার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে আছো, আমি শুধু তেমনি তোমার আত্মায়, তোমার চেতনায় একটু ঠাঁই চাই।'

প্রেমের জালে পুরোপুরি বন্দী হয়ে গেল আন নাসের। রাত তখন অর্ধেকেরও বেশী পার হয়ে গেছে। আন নাসের তবু সেখান থেকে উঠার নাম নিল না। এক সময় লিজাই তাকে বললো, 'রাত প্রায় শেষ হতে চললো। কেউ এভাবে আমাদের দেখে ফেললে পরিণতি খুবই খারাপ হবে। তুমি তোমার কামরায় চলে যাও। কি করে আমরা এখান থেকে বের হবো সে চিন্তা আমি করছি। আমাদের এ সম্পর্কের কথা এখন কাউকে বলার দরকার নেই। কখন কি করতে হবে সময় মত সব আমি তোমাকে জানাবো।'

০

আন নাসের কামরায় প্রবেশ করলো। তার সঙ্গীরা তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। সেও শুয়ে পড়লো, কিন্তু তার চোখে ঘুম এলো না।

লিজাও তার কামরায় প্রবেশ করলো। দেখলো কারিশমা ঘুমিয়ে আছে। সে পোশাক পাল্টাতে শুরু করলো। তখনই চোখ মেলে চাইলো কারিশমা।

'এত দেরী হলো যে?' কারিশমার প্রশ্ন।

'আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর পাথর গলানো কি এতই সহজ যে, এক ফু'তেই মোমের মত নিভে যাবে?' লিজা বললো।

'মোমের মত না নিভুক, আগুনের পরশ পেলে মোমের মত গলতে দোষ কি! তা শেষ পর্যন্ত পাথর কি গললো?'

'কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসবো?'

'না, বলছিলে পাথর খুব শক্ত, তাই বললাম।'

'হ্যাঁ, পাথর খুব শক্ত।' লিজা উত্তর দিল, 'সে জন্যই আমাকে খুব সাবধানে বেছে বেছে তীর ছুঁড়তে হয়েছে। তবে তুমি এখন এ কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারো যে, সে তোমার বান্ধবীর একান্ত গোলাম হয়ে গেছে।'

'সত্যি করে বলো তো, সে তোমার গোলাম হয়েছে, না তুমি তার ক্রিতদাসী হয়ে ফিরে এসেছো? তুমি যে আবেগী মেয়ে, আমার তো ভয় হচ্ছে, পুরুষ স্পর্শে তুমিই না গলে মোম হয়ে যাও!' কারিশমা বললো।

'ভয়টা একেবারে অমূলক নয়। এমন সুন্দর যুবককে দেখলে,

গলে যেতে কতক্ষণ!' লিজা হেসে বললো, 'এ যুবককে সত্যি আমার খুব ভাল লেগেছে। এ ধরনের সরল সুন্দর লোককে ভাল না বেসে পারা যায় না। এর কথা ও কাজে কোন রকম ছলচাতুরী নেই। সাইফুদ্দিনের মত বুড়োর সাথে থাকতে থাকতে জীবনের প্রতি যে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, এর সাথে থাকতে পারলে সেটা কিছুটা দূর হবে।'

'তার মানে ছুড়ি তুই মরেছিস!'

'আরে ধ্যাত, আমাকে এত সরল সহজ মনে করো না।'

কারিশমা বললো, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবি তো? মনে রাখিস, তার হাত দিয়ে আমাদের বড় শত্রু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে খুন করাতে হবে।'

কারিশমা উভয়ের মধ্যে কি কি কথা হয়েছে পুরো কাহিনী শুনলো। শেষে তাকে আরও কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে বললো, 'নে, এবার শুয়ে পড়।' তারা উভয়ে শুয়ে পড়লো।

আন নাসের তখনও জেগেই ছিল। কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে সে লিজার কথাই ভাবছিল। মেয়েটি মিথ্যা তো কিছু বলেনি! তাকে সে সত্যি ভালবাসে। নইলে শেখ মান্নানের হাত থেকে সে ওদের রক্ষা করার ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? দিনেও একবার এ কথা বলতেই কি সে ছুটে এসেছিল? বন্দী হওয়ার পরও যে জামাই আদর পাচ্ছি তার কারণ তো এই মেয়ে। তাহলে তার ভালবাসাকে কি করে মিথ্যা বলবো?

পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল ট্রেনিংকালীন সময়ের কথা। স্মরণ হলো, প্রশিক্ষণের সময় তাদের বার বার সতর্ক করা হয়েছে। খৃস্টান মেয়েদের প্রতারণার কাহিনী তুলে ধরে বলা হয়েছে, খবরদার, এদের সম্পর্কে সাবধান থাকবে। একবার এদের খপ্পরে পড়ে গেলে ইহ ও পরকাল উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। তাহলে লিজা কি সেই ধোঁকা, যে তার ইহকাল ও পরকাল সব বরবাদ করতে এসেছে?

এক অস্বস্তিকর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল আন নাসের। একবার মনে হয়, লিজার ভালবাসা সত্য, আবার মনে হয় ধোঁকা। এভাবে ছটফট করেই বাকী রাতটুকু কাটলো তার। শেষে সে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলো যে, লিজার ভালবাসা ধোঁকা নয়। তার সুঠাম সুন্দর দেহ ও সুদর্শন চেহারা যে কোন মেয়েকেই আকর্ষণ ও আকৃষ্ট করতে পারে। আগুন দেখে পতঙ্গ ঝাঁপ দিলে তাকে অস্বীকার করার কিছু নেই।

এই সিদ্ধান্তে আসার পর তার এতক্ষণের উত্তেজনা ও টেনশন কিছুটা দূর হলো। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে এলো শরীর। সারা রাতের ক্লান্তি ও ঘুম এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। ভোর হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো আন নাসের।

অনেক বেলায় এক লোক তাকে ডেকে তুললো। বললো, 'কারিশমা আপনাকে তার কামরায় ডেকে পাঠিয়েছে।'

আন নাসের উঠে বসলো। হাত-মুখ ধুয়ে লোকটির সাথে রওনা দিল কারিশমার ওখানে। কামরায় কারিশমা একাই ছিল। লোকটি তাকে কারিশমার কামরায় পৌঁছে দিয়েই চলে গেলো।

'বসো, নাসের!' কারিশমা বললো, 'আমি তোমার সাথে খুব জরুরী কিছু কথা বলতে চাই।'

আন নাসের তার সামনে এক চেয়ারে বসলো। কারিশমা বললো, 'আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না যে, রাতে লিজা তোমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, না, তুমি তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলে?'

রাতের প্রসঙ্গ উঠতেই আন নাসের ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। সে কোন রকমে ঢোক গিলে মাটির দিকে চেয়ে রইলো, মুখে কিছু বললো না।

কারিশমাই আবার মুখ খুললো। বললো, 'এ জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করতে এখানে ডেকে আনিনি। আমি জানি, মেয়েটা খুবই সুন্দরী ও শিশুর মত সরল! সে তোমাকে অসম্ভব পছন্দ না করলে এভাবে রাতে গোপনে তোমার সাথে দেখা করতো না। কিন্তু আমি তাকে এবং তোমাকেও এ অনুমতি দিতে পারি না যে, এভাবে রাতভর তোমরা বাইরে কাটাও। এটা একটা কেল্লা, এটা কোন প্রেম কানন নয় যে, সারা রাত তোমরা অভিসারে মেতে থাকবে। হয়তো গত রাতের ঘটনা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। লিজা আমার রুমে না থাকলে হয়তো আমিও টের পেতাম না। কিন্তু প্রতিদিন এমনটি নাও ঘটতে পারে। তোমরা ধরা পড়ে যেতে পারো। ধরা পড়লে তার ফলাফল যে ভাল হবে না, এটুকু বোঝ?'

'জ্বি।' কোন রকমে উচ্চারণ করলো আন নাসের।

কারিশমা বললো, 'ঠিক আছে, এ কথা আমি আর কাউকে

বলবো না। কিন্তু আর কখনো লিজাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে না।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কখনও এমন চেষ্টা করিনি।' আন নাসের বললো, 'রাতে আপনাদের সাথে আলাপ সেরে যাওয়ার পথে হঠাৎ লিজার সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। আমরা দু'জনে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু লিজাকে আমি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিনি।'

'দেখো আন নাসের, আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করো না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি তোমাদের চোখের দিকে তাকিয়েই এমন সব কথা বলে দিতে পারবো, যা হয়তো তোমরা নিজেরাও বলতে পারবে না। লিজা তোমার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে যাক এটা আমি চাই না।' কারিশমা তাকে বললো, 'আমি তোমার কাছেও আশা করবো, তার অল্প বয়সের সুযোগ তুমি গ্রহণ করবে না। এই বয়সে প্রেমের বাণ মেরে যে কোন মেয়েকেই ঘায়েল করা যায়।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। স্বীকার করি, লিজা রাজকুমারীদের মতই রূপসী। তার কাছে এমন রূপ ও যৌবন আছে, যা যে কোন মানুষকে অন্ধ করে দিতে পারে।' আন নাসের বললো, 'কিন্তু আমরা আপনাদের কয়েদী! আর আমি নিজে একজন নগণ্য যোদ্ধা মাত্র। তাছাড়া লিজার ও আমার ধর্ম ভিন্ন। দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে যেমন প্রেম হতে পারে না, তেমনি রাজকন্যা এবং এক বন্দীর মধ্যেও ভালবাসা হতে পারে না।'

'তুমি নারীর স্বভাব সম্পর্কে কিছুই জানো না যুবক।' কারিশমা বললো, 'রাজকুমারী যদি কোন কয়েদীকেই ভালবেসে ফেলে তখন সে তাকেই মনে করে শাহজাদা। ওই শাহজাদার বাহুবন্ধনে বন্দী হওয়ার জন্য সে তখন কেবল ছটফট করতে থাকে। আর ধর্মের কথা বলছো! ধর্মই তো মানুষকে প্রেমিক বানায়। সব ধর্মের সার কথা, মানুষকে ভালবাসো। মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে যে মানব ধর্মের সৃষ্টি হয়, সেটাই তো প্রকৃত ধর্ম! ভালবাসা ধর্মের ক্ষুদ্র বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। তার সাথে আলাপ করে আমি তাজ্জব হয়ে গেছি! সে তোমার এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছে যে, তোমার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। তাকে যখন আমি চাপ দিলাম এবং বললাম, খবরদার, আর কখনো তার সাথে মিশবি না। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না, না, অমন কথা বলো না। তাহলে আমি বাঁচবো না। এখন থেকে আমার বাঁচা মরা সবই আন নাসেরের জন্য।'

আমি বললাম, 'সে এক মুসলমান আর তুই খৃস্টান কন্যা। ধর্ম সাক্ষী করে সে তো তোকে বিয়ে করতে পারবে না!'

'কেন পারবে না, সে যেই খোদাকে মানে আমিও তো তাকেই মানি। যদি ধর্ম তার ও আমার মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আমি তার ধর্ম কবুল করে তার সঙ্গে চলে যাবো।'

আন নাসের অবাক হয়ে শুনছিল কারিশমার কথা। এ কথা শুনে লিজার জন্য তার অন্তরেও ভালবাসার ঢেউ উঠলো। সে তার অসহায়ত্ব আর ভালবাসার জটিল সমীকরণে ডুবে গেল।

চিৎকার করে বললো, 'চুপ করুন। আমিও তো মানুষ, না কি! দয়া মায়া, প্রেম ভালবাসা এসব কি আমার থাকতে নেই? আপনি জানেন, লিজা শুধু আমার জন্যই শেখ মান্নানকে অসন্তুষ্ট করেছে? শেখ মান্নান আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে কারাগারে বন্দী করতে চেয়েছিল। কিন্তু লিজা তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের মুক্ত রেখেছে। কেন সে এ কাজ করেছে? শুধু আমার ভালবাসার টানে। আপনি কি আমাকে তার সাথে গাদ্দারী করতে বলেন? তার পবিত্র ভালবাসাকে অপমান করতে বলেন?'

'শেখ মান্নানও তো লিজাকে ভালবাসে। লিজাকে ভালবাসে বলেই তো সে তার কথায় তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে মুক্ত রেখেছে। ভালবাসে বলেই তো সে লিজার শর্ত মেনে নিয়েছে। এখন লিজাকেও তার শর্ত পূরণ করতে হবে। লিজা যদি শেখ মান্নানের স্বপ্নপুরীতে না যায় তবে কিসের জন্য শেখ মান্নান তোমাদের মুক্ত রাখবে?'

'শেখ মান্নান লিজাকে ভালবাসে না, ভোগ করতে চায়। যদি আপনার কথা মতো ধরে নিই সে লিজাকে ভালবাসে, তাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ লিজা তাকে ভালবাসে না। অতএব শেখ মান্নানের স্বপ্নপুরীতে তার যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। লিজা আমাকে ভালবাসে, আমিও লিজাকে ভালবাসি। অতএব আপনি আপনার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিন। দয়া করে আপনি আমাদের পথ আগলে দাঁড়াবেন না।'

'কিন্তু শেখ মান্নানও তো তার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে আছে। এ

কেল্লার অধিপতি সে। সে কি তোমাদের ভালবাসা মেনে নেবে? যুবক, তুমি বুঝতে পারছো না, তুমি যা বলছো তার পরিণতি কত ভয়ংকর! শেখ মান্নান তোমাদের কাউকেই জীবিত রাখবে না। আমি আবারও বলছি, তুমি লিজার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

'না, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রয়োজন হলে আমি লিজার সম্ভ্রম বাঁচাতে নিজেকে কুরবানী করে দেবো।' আন নাসের বললো, 'যদি সে মেয়ে হয়ে আমার প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পারে, তবে আমি কেন তা প্রকাশ করতে পারবো না? আমি পুরুষ, লিজার প্রতি আমার অন্তরে যেমন গভীর ভালবাসা রয়েছে, তেমনি তাকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার দায়িত্বও রয়েছে। আমি সে দায়িত্ব প্রাণ দিয়েই পালন করবো।'

'আস্তে বলো, দেয়ালেরও কান আছে। আমি বুঝতে পারিনি তোমরা পরস্পরকে এত বেশী ভালবাসো। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে লিজার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, মহাপ্রভু সত্যি তোমাদের দু'জনের অন্তরকে এক করে গেঁথে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মিলনের পথে মহা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শেখ মান্নান। তার মোকাবেলা করার সাধ্য এ মুহূর্তে আমাদের কারো নেই। সে যদি তোমাদের সম্পর্কের কথা টের পায় তাহলে দু'জনকেই খুন করে ফেলবে। সে এক গুপ্তঘাতক দলের সর্দার। তোমাকে গুমাস্তগীনের হাতে তুলে দিতে রাজি

হলেও লিজাকে সে ছাড়বে না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এখন আমি কি করবো?'

দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল কারিশমার চেহারা। একটু পর মুখ তুলে আন নাসেরকে ইশারায় কাছে ডাকলো। আন নাসের তার কাছে গেলে সে বললো, 'তুমি কি সিরিয়াস? তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, তুমি তার সঙ্গে কোন প্রতারণা না করবে না।'

'বুকে হাত দিয়ে নয়, আপনি যদি চান, এই গর্দান কেটে দিয়ে আমি প্রমাণ করবো, আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই।'

'তাহলে আমার কথা শোন। লিজা আমার ছোট বোনের মত। তাকে আমি যেমন শাসন করি, তেমনি ভালও বাসি। আজ সে জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় আমি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। যদি লিজাকে বাঁচাতে চাও এবং নিজে বাঁচতে চাও, তবে তোমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। তোমরা যদি জলদি এ কেল্লা থেকে পালাতে না পারো, তবে লিজাকে শেখ মান্নান তার শর্ত মান্য করতে বাধ্য করবে।'

'না, সে সুযোগ আমি তাকে দেবো না। আপনি একটু রহমদীল হোন। একটু সহায়তা করুন আমাদের। আমি লিজাকে নিয়ে অবিলম্বে এ কেল্লা থেকে পালাতে চাই।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো। ভেবে দেখি কি করা যায়।' কারিশমা বললো, 'তুমি এখন আর কয়েদী নও, গুমাস্তগীনের অনুরোধে শেখ মান্নান তোমাদেরকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। গুমাস্তগীন নিজের মেহমান বলে গণ্য করেছেন তোমাদের।'

আন নাসেরের মনে লিজা সম্পর্কে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, কারিশমার সাথে এ আলাপের মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। লিজার প্রতি তার.ভালবাসা আরও গভীর হলো। লিজাকে দেখা ও তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো তার মন। সে কারিশমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'লিজা এখন কোথায়?'

কারিশমা তাকে বললো, 'রাতে ফেরার পর তাকে আমি অনেক বকাঝকা করেছি। দুঃখে, লজ্জায় সে রাতভর জেগে কাটিয়েছে। ভোরে আমি তাকে আদর করে বললাম, 'কাঁদিস না, যে যুবককে তুই মন দিয়েছিস, সে কয়লা না হীরা আমি বাজিয়ে দেখি। যদি তোদের প্রেম খাঁটি হয়, তাহলে তুই তাকে পাবি। আর যদি দেখি প্রেম নয়, এ শুধু চোখের নেশা, তাহলে তুই মরেছিস। এখন আর কান্নাকাটি করার দরকার নেই। নাস্তা করে পাশের রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক, আমি আন নাসেরের সাথে আলাপ করে তোকে ডেকে তুলবো।'

ও প্রথমে যেতে চায়নি, শেষে আমি জোর করে তাকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। এখন হয়তো সে ঘুমিয়ে আছে।'

কারিশমার তীর পরিপূর্ণ লক্ষ্য ভেদ করলো। সে লিজার জন্য আন নাসেরকে পাগল বানাতে চাচ্ছিল, তার সে উদ্দেশ্য সফল হলো।

আন নাসের সেখান থেকে যেন বাতাসে উড়ে বাইরে এলো। যখন সে তার কামরায় গেল, সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

সে ওদের মিথ্যা বললো এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'পালাবার

একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

কিন্তু সে যে তখন তার দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, বন্ধুরা তার কিছুই টের পেলো না।

০

খৃস্টান অফিসার গুমাস্তগীনের পাশে বসে ছিল। গুমাস্তগীন তাকে বলছিল, 'আন নাসের ও তার সাথীদের নিয়ে দু'এক দিনের মধ্যেই আমি হারান যাত্রা করবো।'

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো কারিশমা। সে তাদের দু'জনকে বললো, 'এই কমাণ্ডার এখন আমাদের জালে বন্দী।'

খৃস্টান অফিসার বললো, 'কি বললো আন নাসের? সে কি সত্যি লিজার ফাঁদে ধরা দিয়েছে? কি বুঝলে তার সাথে আলাপ করে?'

কারিশমা সব কথা খুলে বললো তাদের। জানালো কেমন করে আন নাসেরের মন লিজার মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে। এখন যে সে পরিপূর্ণভাবেই লিজার নিয়ন্ত্রণে আছে, এ কথা জানিয়ে কারিশমা বললো, 'এই লোকগুলোকে দিয়ে সহজেই সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করানো যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে তাদের প্রস্তুত করতে হয়তো কয়েকদিন সময় লাগবে। এদেরকে কত তাড়াতাড়ি তাদের আদর্শ থেকে সরিয়ে আনা যায়, সে চেষ্টাই এখন আমাদের মূল কাজ। আদর্শ থেকে সরে

এলেই তারা নির্দ্বিধায় সুলতানকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।'

'আমি এই চার কমাণ্ডোকে দু'একদিনের মধ্যেই হারানে নিয়ে যেতে চাই।' গুমাস্তগীন বললো, 'তোমরা কি দু'জনই আমার সাথে যাবে, নাকি লিজা একা? ওদেরকে খুনের ব্যাপারে তৈরী করতে হলে তোমাদের সহযোগিতা অবশ্যই লাগবে।'

'আমি মেয়েদেরকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।' বললো খৃস্টান অফিসার, 'আমি আর দেরী করতে পারছি না। বর্তমান যুদ্ধের খবর আমাকে সরকারের কাছে পৌঁছাতে হবে। সরকারকে জানাতে হবে, হলব, 'মুশেল ও হারানের সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থা শোচনীয়। ময়দান ছেড়ে তাদের বীর সেনাপতিরা পালিয়েছে।'

'কেন, এ খবর কি তোমাদের সরকার এখনো পায়নি?'

'হয়তো পেয়েছে। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় কি সে সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি সরকারকে এখানকার ক্রুসেডারদের অবস্থা জানিয়ে এ পরামর্শ দিতে চাই যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত করার জন্য আমাদের বিকল্প পন্থা অনুসরণ করতে হবে। সম্মিলিত বাহিনীকে দিয়ে আমাদের আশা পূরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। সরকারকে এ পরামর্শ দেয়ার জন্যই আমাকে দ্রুত সেখানে যেতে হবে।'

'তুমি এ পরামর্শ দিলে তো তোমাদের তরফ থেকে আমরা যে সাহায্য পাচ্ছিলাম তা বন্ধ হয়ে যাবে!' শঙ্কিত কণ্ঠে বললো

গুমাস্তগীন, 'এমন কথা বলো না ভাই! আমাদের আর একবার সুযোগ দাও, আইয়ুবীকে আমিই হত্যা করবো। তারপর দেখবে কেমন বিজয়ীর বেশে আমি দামেশকে প্রবেশ করি।

তুমি দুই মেয়েকেই সঙ্গে না নিয়ে অন্তত লিজাকে আমার কাছে রেখে যাও। সে এরই মধ্যে কমাণ্ডোদের নেতার উপর তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। এখন সে সহজেই তাকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে নিতে পারবে।'

'কিন্তু ওদের সহযোগিতা যে আমারও দরকার।' বললো খৃস্টান অফিসার।

গুমাস্তগীনের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো অনুনয়। বললো, 'আন নাসের সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডো বলে বিনা বাঁধায় যে কোন সময় তার কাছে যেতে পারবে। কারিশমার কথাই ঠিক, তাকে প্রস্তুত করতে পারলে সে সহজেই সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারবে। এখন চিন্তা করে দেখো, তুমি যদি লিজাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তবে আন নাসেরকে তৈরী করবে কে? সে ছাড়া এই কমাণ্ডোদের সঙ্গে নিয়ে আমি কি করবো?'

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর খৃস্টান অফিসার বললো, 'তবে এক কাজ করি। ওদেরকে হারান পাঠানোর পরিবর্তে আমিই এখানে আরো কিছুদিন থেকে যাই। এই সময়ের মধ্যে মেয়েরা তাদেরকে কাজের উপযোগী করে দেবে। লিজা প্রস্তুত করবে আন নাসেরকে, আর তার সঙ্গী তিনজন কমাণ্ডোকে ট্রেনিং দেবে কারিশমা। তাদের কাজ তো একটাই,

কমাণ্ডোদের মনে সুলতান আইয়ুবীর প্রতি দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ সৃষ্টি করা।'

'আন নাসের সম্পর্কে আমার ধারণা, সে নারীর ব্যাপারে খুবই দুর্বল।' কারিশমা বললো, 'লিজা এত অল্প সময়ে তাকে কাবু করতে পারবে, আমার ধারণা ছিল না। মহব্বতের তীরে সে পুরোপুরি ঘায়েল হয়ে গেছে। লিজা এখন তাকে চোখের ইশারায় নাচাতে পারবে।'

খৃস্টান অফিসার বললো, 'আজ তাদের চার জনকেই এক সাথে খাওয়ার দাওয়াত দাও। এতে সবাই তোমাদের সাথে আরও ফ্রি হবে। তুমি এমন পরিবেশ তৈরী করো, যাতে ওরা আমাদের শত্রু না ভেবে বন্ধু মনে করে।'

আহারের সময় হলো। আন নাসের ও তার সঙ্গীদের ডাকা হলো খাওয়ার টেবিলে। তারা এলে এক সাথে সবাই খেতে বসলো। বাবুর্চি সবার সামনে প্লেট, গ্লাস দিচ্ছে; এ সময় শেখ মান্নানের এক খাদেম এসে অফিসারের কানে কানে কিছু বললো। অফিসার সবার দিকে ফিরে বললো, 'তোমরা খাও। আমি আসছি।'

খৃস্টান অফিসার খাবার টেবিল থেকে উঠে শেখ মান্নানের কামরায় প্রবেশ করলো।

'মেয়েটি সম্পর্কে তুমি কি চিন্তা করেছো?' অফিসারকে সামনে পেয়েই শেখ মান্নান জিজ্ঞেস করলো।

'আমি যখন যাবো, তাদের দু'জনকে সাথে করে নিয়ে যাবো।' খৃস্টান অফিসার উত্তর দিল।

'তোমার যাওয়ার আগ পর্যন্ত মেয়েটি আমার কাছে থাকবে।' শেখ মান্নান বললো।
'আমি আজই চলে যাবো।' বললো খৃস্টান অফিসার।
'ঠিক আছে যাও।' শেখ মান্নান বললো, 'তবে মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে যাবে। একে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তুমি পাবে না।'
'মান্নান!' খৃস্টান অফিসার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'সাবধান! আমাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস করলে এই কেল্লার ইটগুলোও গুড়ো হয়ে যাবে।'
'ও, মনে হচ্ছে তোমার মাথা এখনও ঠিক হয়নি।' শেখ মান্নান চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'আজ রাতে মেয়েটিকে এখানে আসতেই হবে। তুমি যদি যেতে চাও, একা যাও। আর যদি এখানে থাকো, রাতে মেয়েটিকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে। যদি আমার এ হুকুমের অন্যথা করো তবে রাতে তুমি থাকবে কারাগারের গোপন কক্ষে, আর মেয়েটি থাকবে আমার পাশে। যাও, এখনও সময় আছে, ভেবে চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নাও।'
খৃস্টান অফিসার এ কথার কোন জবাব না দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

o

খাবারের কামরায় এসে প্রবেশ করলো অফিসার। সবাই অধীর হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। উৎসুক প্রশ্ন নিয়ে সবাই

তাকালো তার দিকে। বললো, 'কি খবর? কোথায় গিয়েছিলে?'
'দেখো বন্ধুগণ! শেখ মান্নান আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আজ রাতে যদি লিজাকে আমি তার মহলে পৌঁছে না দেই, তবে সে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপের হুমকি দিয়েছে। বলেছে, আমাকে কারা প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে লিজাকে সে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'
'আপনাকে কারাগারের গোপন কক্ষে পাঠাবে আর লিজাকে জোর করে তার মহলে নিয়ে যাবে! কেন, আমরা কি মরে গেছি?' আন নাসের বললো, 'লিজাকে সে কোন দিনই পাবে না। তার ইজ্জতের জিম্মা আমি নিয়েছি।'
আন নাসেরের এক সঙ্গী অবাক হয়ে বললো, 'এই মেয়েটির সাথে তোমার কি সম্পর্ক আন নাসের? যে মেয়ে আমাদের পাকড়াও করে এখানে নিয়ে এসেছে, তার ইজ্জত রক্ষার জিম্মা তুমি নিতে যাবে কেন?'
'তোমরা নিজেদেরকে এখন আর কয়েদী ভেবো না।' গুমাস্তগীন বললো, 'এ বিপদ তো আমাদের সবার জন্য এসেছে।'
কারিশমা বললো, 'তোমাদেরকে আমরাই ধরে এনেছি ঠিক, কিন্তু এখন আর তোমরা আমাদের বন্দী নও, শেখ মান্নানের মেহমান।'
খৃস্টান অফিসার বললো, 'তোমরা আমাদের সাথে চলো। আমরা এখন সবাই শেখ মান্নানের জালে আটকা পড়ে গেছি। অতএব এখান থেকে বেরোনোর চেষ্টাও আমাদের

সম্মিলিতভাবেই করা উচিত।'

'কিন্তু এখান থেকে কেমন করে বের হবো আমরা? শেখ মান্নান তো আমাদের সবাইকে তার পাহারার মধ্যেই রেখেছে।' বললো আন নাসের।

'শেখ মান্নান আমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছে, এই চারজন কমাণ্ডোকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো।' গুমাস্তগীন বললো, 'আমি এদেরকে নিয়ে আজই রওনা হয়ে যাবো। তোমরা জলদি তৈরী হয়ে নাও। আমরা সন্ধ্যার আগেই রওনা দেবো।'

ওরা খাবার টেবিলে বসেই ওখান থেকে কিভাবে পালাবে তার শলাপরামর্শ করলো। এ ক্ষেত্রে দিশারীর ভূমিকা নিল গুমাস্তগীন। সে তার গোপন পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরলো। পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে যে যার কামরায় ফিরে গেল।

গুমাস্তগীন তার চাকর ও দেহরক্ষীদের ডেকে বললো, 'জলদি তৈরী হয়ে নাও। সন্ধ্যার আগেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।'

গুমাস্তগীনের এ তাৎক্ষণিক ঘোষণায় কিছুটা অবাক হলো তার লোকজন। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন না করেই যে যার মত আসবাবপত্র গুছাতে লেগে গেল।

কাফেলা তোড়জোড়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তাদের নিজস্ব ঘোড়া ছাড়াও অতিরিক্ত চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করা হলো কমাণ্ডোদের জন্য। চারটি উটের পিঠে মাল-সামান বোঝাই করা হলো। সঙ্গে নেয়া হলো প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়।

আছিয়াত থেকে হারান অনেক দূরের পথ। একাধিক রাত তাদের কাটাতে হবে পথে, মরুভূমির মধ্যে। ফলে সঙ্গে নেয়া হলো তাঁবু এবং তাঁবু খাটানোর অন্যান্য সরঞ্জাম। মাল-সামানে উটগুলোর পিঠ বোঝাই হয়ে গেলো। গুমাস্তগীন নিজে তদারক করলো প্রস্তুতিপর্ব।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে গুমাস্তগীন শেখ মান্নানের কাছে বিদায় নিতে গেল। তাকে বললো, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার মেহমানদারীর কথা বহুদিন মনে থাকবে আমার। আমি যাওয়ার জন্য তৈরী। যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম। আশা করি তুমিও সময় করে আমার ওখানে বেড়াতে আসবে।'

শেখ মান্নান তার সাথে করমর্দন করে খুশীর সাথেই বললো, 'অবশ্যই, অবশ্যই।'

'আমি কি তাহলে এখন তোমার দেয়া চার কমাণ্ডোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি?'

'কেন নয়। আপনার সাথে তো ওদের সম্পর্কে সব লেনদেন শেষ হয়েছে। আপনি যখন সোনা ও মুক্তা দিয়ে ওদের মূল্য পরিশোধ করেছেন, তখন থেকেই তো ওরা আপনার সম্পত্তি হয়ে গেছে।'

'যাওয়ার আগে সালাহউদ্দিন প্রসঙ্গ তোমাকে আরেক বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি আশা করি, ক্রুসেডারদের দাবী অনুসারে যে চারজন ভাড়াটে খুনীকে পাঠিয়েছো সুলতানকে হত্যা করতে, তারা এবার সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে শেষ করেই

ফিরবে।'

শেখ মান্নান বললো, 'আইয়ুবীর বিষয়টা আমি দেখছি। তুমি সাইফুদ্দিনকে সামলাও। যে চারজন কমাণ্ডোকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, ওদের দিয়ে হত্যা করাও সাইফুদ্দিনকে।' শেখ মান্নান আরও বললো, 'তোমরা আর যুদ্ধ করতে পারবে না। সে শক্তি এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। এবার ঘরের শত্রুদের চোরের মত গোপনে হত্যা করো।'

'এ নিয়ে তুমি ভেবো না, সাইফুদ্দিন তো আর আইয়ুবী নয় যে, তাকে হত্যা করা খুব কঠিন কিছু। তুমি ধরে নাও, সাইফুদ্দিন দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে।'

'ভাল কথা! তোমার খৃস্টান বন্ধু ও তার পরী দু'টি কোথায়?'

'তারা তাদের কামরাতেই আছে।' গুমাস্তগীন বললো।

'সে তোমার কাছে ছোট মেয়েটির ব্যাপারে কোন কথা বলেনি তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি ছোট মেয়েটাকে আজ রাতে তোমার কাছে পাঠাবে। শুনলাম, মেয়েটাকে খৃস্টান অফিসার বলছে, 'লিজা, এই বেলা তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। রাতে আজ শেখ মান্নানের ওখানে দাওয়াত আছে আমাদের। ঘুম থেকে উঠে এমন সাজ পোশাক পড়বে, দেখলে যেন ভোরের শিশির ভেজা তরতাজা ফুলের মত মনে হয়।' গুমাস্তগীন বললো, 'তার কথায় মনে হলো, সে তোমাকে খুবই ভয় পাচ্ছে।'

'বুদ্ধিমান অফিসার।' বললো শেখ মান্নান, 'এখানে বড় বড় শক্তিধর সম্রাটরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, আর ও তো এক

অফিসার মাত্র। হতভাগা আমার কাছ থেকে মেয়েটাকে লুকাতে চেয়েছিল, যেন সে তার কন্যা!'

গুমাস্তগীন তার কাছ থেকে বিদায় নিল। তাকে এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত সঙ্গে এলো শেখ মান্নান।

গেটের কাছে কাফেলা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুমাস্তগীন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলো। তার দেহরক্ষীরাও ঘোড়ায় আরোহণ করলো। দেহরক্ষীদের দু'জন সামনে ও দু'জন পিছনে চললো গুমাস্তগীনের। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা।

গুমাস্তগীনের পিছনেই আন নাসের ও তার সঙ্গীরা। সবার পিছনে মাল বোঝাই উটের বহর।

কেল্লার গেট খুলে দেয়া হলো। কাফেলা ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল কেল্লার। শেষ বারের মত হাত নেড়ে গুমাস্তগীনকে বিদায় জানিয়ে গেট বন্ধ করার হুকুম দিল শেখ মান্নান। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার গেট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

০

কেল্লার দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল কাফেলা। দ্রুত পা চালিয়ে ওরা অনেক দূরে সরে এলো। ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্ত রক্তিম হয়ে উঠলো। সূর্য ডুবতে শুরু করলো। কাফেলা তার চলার গতি তীব্রতর করে ছুটে চললো হারানের দিকে।

প্রতিদিনের মত সন্ধ্যা নেমে এলো কেল্লায়। প্রহরীরা সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল কেল্লার ঘরে ঘরে। রাস্তার মোড়েও জ্বালানো হলো বাতি। শেখ মান্নানের বিনোদন মহলের ঝাড়বাতিগুলোও জ্বলে উঠলো।

সন্ধ্যা পেরিয়ে নেমে এলো রাত। চারদিক ছেয়ে গেল গভীর আঁধারে। শেখ মান্নান অস্থির হয়ে দারোয়ানকে ডাকলো। বললো, 'সেই খৃস্টান অফিসার কি এখনও মেয়েটাকে নিয়ে আসেনি?'

'জ্বি না, জনাব।'

'ঠিক আছে যাও।'

একটু পর আবার ডাকলো। দারোয়ান একই জবাব দিল। তৃতীয় বার ডাকার পরও যখন দারোয়ান বললো, 'জ্বি না, জনাব' শেখ মান্নান তার ব্যক্তিগত চাকরকে ডেকে বললো, 'ঐ খৃস্টান অফিসারকে গিয়ে বলো, মেয়েটাকে নিয়ে যেন অতি সত্তর এখানে চলে আসে।'

চাকর খৃস্টান অফিসারের কামরায় গেল, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। মেয়ে দু'টির কামরায় গেল চাকর, সেখানেও কেউ নেই। ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের নাম ধরে ডাকাডাকি করলো, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে। চারদিকে খুঁজলো, কিন্তু কোন সন্ধান পেল না তাদের।

চাকর আশপাশের সবগুলো কামরা একে একে ঘুরে দেখলো, সবগুলোই শূন্য। সে এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে দেখলো, কেল্লার বাগানে গিয়ে তালাশ করলো ওদের। আশপাশের উঠান, আঙ্গিনা সর্বত্র খুঁজলো। শেষে নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে শেখ মান্নানকে বললো, 'খৃস্টান অফিসার ও তার দুই মেয়েকে কোথাও পাওয়া গেল না।'

শেখ মান্নান বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে বললো, 'কি

বলছিস তুই। কেল্লার ফটকে বলা আছে ওদের যেন বাইরে যেতে দেয়া না হয়। নিশ্চয়ই ওরা কেল্লার ভেতরেই আছে, ভাল করে খুঁজে দেখ।'

চাকর বললো, 'আমি ওদের সবগুলো কামরা খুঁজে দেখেছি। আশপাশ, বাগান, কোথাও খুঁজতে বাদ রাখিনি।'

'তাহলে?' বিস্মিত শেখ মান্নান বললো, 'জলদি সেনা কমাণ্ডারকে ডাকো।'

শেখ মান্নানের তলব পেয়ে ছুটে এলো সেনা কমাণ্ডার। শেখ মান্নান বললো, 'খৃস্টান অফিসার ও মেয়েরা কোথায় আছে খুঁজে বের করো।'

হুকুম পেয়ে ছুটলো সেনা কমাণ্ডার। কেল্লার প্রাচীরের পাশের খাদে, ঝোঁপ-ঝাড়ে সর্বত্র খুঁজলো ওদের। বললো, 'ওরা কেল্লায় নেই জনাব।'

শেখ মান্নান বললো, 'এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। যেভাবেই হোক ওদেরকে খুঁজে বের করো।'

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফেদাইন খুনী ও সৈন্যদের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। মশাল নিয়ে ওরা হন্যে হয়ে ছুটলো কেল্লার প্রতিটি কোণে। অন্ধকারে সৈন্যদর দেখা যাচ্ছিল না, চারদিকে শুধু দেখা যাচ্ছিল আলোর নাচন। বিশাল কেল্লার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত আলোর ফুলগুলো ছুটে বেড়ালো অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলো যে, কেল্লার মধ্যে কোথাও খৃস্টান অফিসার ও মেয়ে দু'টি নেই।

শেখ মান্নান গেটে ডিউটিরত তার অর্ধ ডজন প্রহরীকে ডাকলো। যারা সে সময় পাহারায় নিযুক্ত ছিল এবং যারা বিশ্রামে ছিল তাদের সকলকে একত্র করে শেখ ম্যান্নান জিজ্ঞেস করলো, 'গুমাস্তগীনের কাফেলা ছাড়া অন্য কারো জন্য কি আজ গেট খোলা হয়েছিল?'

তারা ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'আপনার আদেশ ছাড়া কখনো গেট খোলা হয় না। আজ একবারই গেট খোলা হয়েছিল, যখন আপনি গেটে উপস্থিত ছিলেন।'

'তোমরা কি দু'টি মেয়ে ও খৃস্টান লোকটিকে এ কেল্লা থেকে বের হতে দেখেছো?'

'আলবত না হুজুর।' ভয়ে কাচুমাচু হয়ে বললো প্রহরীরা।

'গুমাস্তগীনের কাফেলার সাথে কি ওদের দেখেছিলে?'

'জ্বি না হুজুর। ওনার কাফেলার সাথে খৃস্টান লোকটি বা কোন মেয়ে ছিল না।'

'তাহলে বলো, একজন খৃস্টান অফিসার এবং দু'টি মেয়ে কেমন করে কেল্লা থেকে গায়েব হয়ে গেল? তাদের কি পাখা আছে যে; তারা হাওয়ায় উড়ে গেল? নাকি তারা জ্বীন-পরী বা যাদু কন্যা ছিল যে, ভোজবাজির মত সবাই হাওয়া হয়ে গেল?'

প্রহরীরা এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না। তারা মাথা নিচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল। কেউ দেখলে মনে করবে, এখুনি এসব অপরাধীদের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করা হবে।

গভীর রাতে শেখ মান্নান তার কামরায় গেল। রাগে ও গোস্বায় তার চেহারা তখনো টগবগ করছিল।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়ে গেল, গুমাস্তগীনের কাফেলা তখনো পূর্ণোদ্যমে ছুটছিল। চারদিকে হালকা অন্ধকার। পথ চলতে চলতে এক সময় থেমে গেল গুমাস্তগীন। সঙ্গী দেহরক্ষীদের বললো, 'এবার থামো।'

কাফেলা থামতেই তিনি উট চালকদের বললেন, 'উটগুলোকে জলদি বসাও। তাঁবুর বোঝার মধ্য থেকে ওদের বের করে দেখো, ওরা এখনো বেঁচে আছে, নাকি দম বন্ধ হয়ে এরই মধ্যে মারা গেল?'

উট চালকেরা উটকে বসালো। উটের পিঠ থেকে তাঁবুর বোঝা নামিয়ে দ্রুত হাতে তাঁবুর বাঁধন খুললো। বাঁধন খুলতেই তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো খৃস্টান অফিসার, কারিশমা ও লিজা।

না, কেউ মারা যায়নি। তবে তাদের গায়ের ঘামে তাঁবুগুলো ভিজে গিয়েছিল। গরমে তিনজনেরই জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিল। চোখ ঘোলাটে এবং রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও তারা গুমাস্তগীনের ওপর কৃতজ্ঞ ছিল এ জন্য যে, গুমাস্তগীন তাদেরকে তাঁবুতে জড়িয়ে আছিয়াত দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে এসেছে।

কেল্লা থেকে এখন তারা অনেক দূরে, নিরাপদ স্থানে। শেখ মান্নানের ফেদাইন দল পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলবে, এমন কোন ভয়ও নেই আর। আর এসেই বা কি করবে, তারা তো সম্মুখ যুদ্ধে পটু নয়। সামনাসামনি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে

চাইবে না তারা। তাই ক্লান্ত খৃস্টান অফিসার সেখানেই রাতের মত তাঁবু করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু গুমাস্তগীন সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললো, 'আমি শেখ মান্নানকে চিনি। কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না। এখানে আমরা বিশ্রামের জন্য থামিনি, থেমেছি তোমাদেরকে তাঁবুর বাণ্ডিল থেকে বের করার জন্য।'
আন নাসেরও বললো, 'উনি ঠিকই বলেছেন। বিশ্রাম না করে আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া দরকার।'
ফলে কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করলো। মেয়ে দু'টিকে দুই উটের পিঠে তুলে দেয়া হলো। খৃস্টান অফিসার গুমাস্তগীনের এক রক্ষীর ঘোড়া নিয়ে চারজন কমাণ্ডোর সাথে সাথে চললো। চলতে চলতে খৃস্টান অফিসার আন নাসেরের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল। তার কথার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। আন নাসেরের মন থেকে ভয়ের ভাব কেটে গিয়েছিল। সেও অফিসারের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলো।
মধ্য রাতের পর কাফেলাকে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য থামতে হুকুম দিল গুমাস্তগীন। থেমে গেল কাফেলা। থেমেই তাঁবু খাটানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই।
গুমাস্তগীনের জন্য পৃথক তাঁবু টানানো হলো। মেয়েদের জন্যও আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করা হলো। রক্ষী ও কমাণ্ডোরা তাঁবু না টানিয়েই খোলা আকাশের নিচে শুয়ে পড়লো।
আন নাসেরের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল লিজাকে আপন করে পাওয়ার স্বপ্ন। শুয়ে শুয়ে লিজার কথাই ভাবছিল সে। মজার ব্যাপার হলো, সেই রাতেই লিজাকে কাছে পাওয়ার

সুযোগও পেয়ে গেল সে।
কাফেলার সবাই ছিল বড্ড ক্লান্ত। দীর্ঘ পথশ্রমের সাথে যুক্ত হয়েছিল ফেদাইনদের ধাওয়া করার ভয়। এই টেনশন ও ক্লান্তি থেকে তাদের মুক্তি দিল ঘুম। শোয়ার সাথে সাথেই নিদ্রা এসে জড়িয়ে ধরলো তাদের।
কিন্তু আন নাসেরের চোখে কোন ঘুম ছিল না। সে তখন শুয়ে শুয়ে সে লিজার কথাই চিন্তা করছিল। একবার ভাবলো, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, এই ফাঁকে লিজার কাছে চলে যাই না কেন? কারিশমা তো আমাদের ব্যাপারটা জানেই। পরক্ষণে মনে হলো, না, এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না। লিজা তাকে অন্য রকম ভাবতে পারে। তারচে, একটু অপেক্ষা করেই দেখি না কেন। লিজাও তো চলে আসতে পারে!
এইসব নানা রকম চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছিল আন নাসের। সে যে একজন কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডার, এ কথা সে ভুলেই গিয়েছিল! ভুলে গিয়েছিল, তার মত অন্যান্য কমাণ্ডোরা তখনো সারা দেশে ছড়িয়ে থেকে ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন বাজী রেখে গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তার মনে এ চিন্তাও কাজ করছিল না যে, তাকে আবার তার বাহিনীতে ফিরে যেতে হবে।
তার অন্যান্য সাথীরাও শুয়ে পড়েছিল। সে ভেবেছিল, তার সাথীরাও সবার মতই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার তিন সাথীর চোখে তখন ঘুম ছিল না। অন্যান্যদের সাথে তারাও শুয়ে পড়েছিল ঠিক, কিন্তু শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, কি করে এই চক্রের

হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

তারা ভেবে দেখলো, পালিয়ে যাওয়ার এটাই মহা সুযোগ। সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন! পাশেই রয়েছে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। রয়েছে খাদ্য ও পানীয়। তারা আশা করছিল, কমাণ্ডার এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। তাদের এখন প্রয়োজন শুধু কমাণ্ডারের একটু নির্দেশ বা সংকেত। তাদের যে প্রশিক্ষণ আছে তাতে গুমাস্তগীনসহ সবাই মিলে বাঁধা দিলেও তারা সে বাঁধার মোকাবেলা করে টিকে যেতে পারবে। তাই না ঘুমিয়ে ওরা কমাণ্ডারের একটু ইশারার অপেক্ষা করছিল।

তাদের তো আর জানা ছিল না, তাদের কমাণ্ডার ইতোমধ্যেই তার বুদ্ধি-বিবেক, তার ঈমান ও আকিদা এবং তার সৈনিকসুলভ চেতনা এক যুবতীর পায়ের তলে সমর্পণ করে বসে আছে। এক খৃস্টান মেয়ে তার সমস্ত সৎ গুণাবলী ধ্বংস করে দিয়ে নিজের সারা জীবনের পাপের বোঝা নিয়ে আন নাসেরের পিঠে সওয়ার হয়ে গেছে!

আন নাসের শুয়েছিল লিজাদের তাবুর দিকে মুখ করে। অন্ধকারেও সে দেখতে পেল, তাবু থেকে একটি কালো ছায়া বেরিয়ে এসেছে। ছায়াটি পা টিপে টিপে তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। ছায়াটি কোন পুরুষের নয়, একটি মেয়ের।

এ দৃশ্য দেখার সাথে সাথেই সেও উঠে বসলো এবং ঘুমন্ত সাথীদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগলো। কিছুটা তফাতে গিয়ে সে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো এবং পা টিপে টিপে ছায়াটির দিকেই অগ্রসর হলো।

অল্প সময় পরেই দু'টি ছায়া একাকার হয়ে গেল।
লিজা আন নাসেরকে ঘুমন্ত কাফেলা থেকে সরিয়ে দূরে এক টিলার পাশে নিয়ে গেল।
তার কথা থেকে ঝরে পড়ছিল প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাস। শেখ মান্নানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে এই আনন্দে তার লাফাতে ইচ্ছে করছিল। আন নাসেরকে একান্ত করে কাছে পেয়েছে এই আবেগে সে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।
লিজার এই আবেগ দেখে আন নাসেরও আবেগে উদীপ্ত হয়ে উঠলো। বিশ্ব প্রকৃতি ভুলে দু'জনই ভেসে চললো আবেগের সাগরে। লিজা তার মনের আবেগ প্রকাশ করছিল হাত-পা নেড়ে। খেলনা পেলে কচি খুকীরা যেমন আনন্দে লাফায় তেমনি লাফাচ্ছিল সে। হঠাৎ তার কি হলো, আন নাসের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামান্য দূরে সরে গিয়ে বললো, 'আন নাসের, তোমাকে একটি কথা বলবো, তোমার জীবনে কি আর কোন নারী এসেছে?'
'আমার মা ও বোন ছাড়া জীবনে আমি আর কোন নারীর সান্নিধ্য পাইনি!' আন নাসের বললো, 'তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী, যে ভালবাসার পসরা নিয়ে আমার জীবনে এসেছো, হৃদয়ের কড়া নেড়ে জাগিয়েছো আমায়।'
'তুমি সত্যি বলছো তো!'
'দেখো, আমি মিথ্যে বলি না। যৌবনের প্রারম্ভেই আমি নূরুদ্দিন জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করি। তার পরের দিনগুলো কেটেছে আমার যুদ্ধের ময়দানে। মরুভূমির তপ্ত

বালুকারাশি, দুর্গম পাহাড়, অরণ্য, সর্বত্র ছুটে বেরিয়েছি আমি। আপনজন থেকে দূরে নির্জন প্রান্তরে শিকারী বাঘের মত খুঁজে ফিরেছি দুশমন। মেতে উঠেছি রক্ত দেয়া-নেয়ার খেলায়। এর বাইরে যে কোন জীবন আছে, সে কথাটাই মনে হয়নি কখনো। তোমাকে দেখার আগে নারীকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনও পড়েনি, সময়ও হয়নি।'

সারাক্ষণ তৎপর থাকতাম অর্পিত দায়িত্ব পালনের কাজে। দায়িত্বশীল কমাণ্ডার হিসাবে আমার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমি যেখানেই থাকি দায়িত্ব পালনে কখনও ত্রুটি করি না। কারণ দায়িত্ব পালনকে আমি কেবল ডিউটি মনে করি না, দায়িত্ব পালন আমার ঈমানেরই অঙ্গ।'

ঈমান শব্দটি উচ্চারণ করতেই তার ভেতরটা হঠাৎ নড়ে উঠলো। চমকে উঠে কথা বন্ধ করে দিল সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর লিজা তাকে প্রশ্ন করলো, 'কি ভাবছো?'

'লিজা! তুমি হয়ত আমার ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছো! আমাকে বলো তো, তোমরা আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'তার আগে তুমি আমাকে বলো, আমার ভালবাসা ও রূপ-লাবণ্য দেখে তোমার মনে কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠেছে কি না?' লিজা এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, যার মধ্যে রসিকতার সামান্যতম লেশও ছিল না।

লিজাকে সিরিয়াস হতে দেখে আন নাসেরও সিরিয়াস হয়ে উঠলো। বললো, 'তোমার মনে এমন প্রশ্ন জাগলো কেন?'

'তুমি তো আমাকে বলেছিলে, আমাদের ভালবাসা পবিত্র। এ পবিত্র ভালবাসা কখনো তুমি অপবিত্র করবে না!'

আন নাসের বললো, 'আমি প্রমাণ করবো, আমি পশু নই।'

'তাহলে তোমার মনে এ ধারণা কেন এলো যে, আমি তোমার ঈমান দুর্বল করে দিয়েছি? আমরা উভয়েই আমাদের ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ। আমি এটাও তোমাকে বলেছি, তুমি যদি চাও, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করে তোমার ধর্ম কবুল করে নেবো। তাহলে এ কথার মানে কি? আমার ভালবাসা নিয়ে কি করে তোমার মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হলো? তুমি কি জানো, আমাদের খৃস্টান জাতিতেও তোমার চেয়ে সুদর্শন যুবক আছে? যারা বীর যোদ্ধা, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক? তারা আমাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে। আমাকে পাওয়ার জন্য কত যুবক যে পাগলপারা, কই, আমি তো তাদের কাউকে মন দেইনি!'

আন নাসেরের যে কি হলো সে বলতে পারবে না, লিজাকে শান্তনা দেয়ার পরিবর্তে বলে উঠলো, 'তাহলে তুমি সেখানেই চলে যাওনা কেন? আমার মধ্যে এত কি গুণ দেখেছো যে, আমাকে আকৃষ্ট করছো?'

লিজা আশা করেনি, এ পর্যায়ে এসে আন নাসের এমন উত্তর দিতে পারে। সে এ উত্তর শুনে প্রচণ্ড আশাহত হলো এবং এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে গুম মেরে বসে রইলো।

আন নাসের তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমার কথার উত্তর দাও লিজা! এভাবে চুপ করে থেকো না, বলো, তুমি আমার

মাঝে কি পেয়েছো?'

লিজা কোন কথা বললো না। সে তার মাথাটি হাঁটুর উপর রেখে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো। আন নাসের তার কান্নার শব্দ শুনতে পেল। সে লিজার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কাঁদছো কেন? আহা, কি হয়েছে বলবে তো?'

লিজা এবারও কোন কথা বললো না, কাঁদতেই থাকলো। আন নাসের বার বার তাকে জিজ্ঞেস করলো সে কেন কাঁদছে। কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে লিজা ফুলে ফুলে কেঁদেই চললো।

আন নাসের তার এ কান্না সইতে পারলো না। কান্না এক সংক্রামক আবেগের নাম। এ কান্না দেখে তার নিজের ভেতরও ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো, এমন প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি তার। সে তাকে বললো, 'ভুল হয়ে গেছে লিজা, এমন কথা আর কোনদিন বলবো না।'

তাতেও থামলো না লিজার কান্না। তখন আন নাসের তাকে নিজের বাহুর বেষ্টনীতে নিয়ে নিল। বাঁধা দিল না লিজা, বরং ওর বুকে মাথা রেখে আরও জোরে কাঁদতে লাগলো।

এ কান্নার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না আন নাসেরের। কয়েক মিনিটের এ কান্না যে তার সারা জীবনের সংযম ভেঙে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, এ কথা বুঝার মত মানসিক শক্তি তার ছিল না। সে তখন বিপর্যয়কর মানবিক দুর্বলতার শিকার। যে দুর্বলতা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রায় লুপ্ত করে দেয়। সে তখন লিজার মনে কষ্ট দেয়ার অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিল। সেই অনুতাপ তাকে লিজার প্রতি আরো দুর্বল করে তুলছিল। সেই

দুর্বলতার শিকার হয়ে আন নাসের ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছিল লিজার মধ্যে।

এ ছিল সেই দুর্বলতা, যে দুর্বলতা রাণীকে তার গোলামের কাছে নত করে দেয়। যে দুর্বলতার কারণে রাজা তার রাজকীয় ভাণ্ডার ও অর্থ-সম্পদকে পাথরের মত মূল্যহীন ভেবে রাজমহল ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় সাধারণ পর্ণকুটিরে। একটু মানসিক শান্তির আশায় জমিদার পথে নামে মুসাফিরের বেশে।

লিজাও ভালবাসার পিপাসু ছিল। সেই ভালবাসা, যে ভালবাসা আত্মাকে শান্তি দেয়। সে দৈহিক প্রেম এমন সব পুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে, যাদের সে ঘৃণা করে। সে আছিয়াত দুর্গে আসার পথে এবং কেল্লায় পৌছেও কারিশমার কাছে তার এই মনের আবেগ প্রকাশ করে ছিল।

আন নাসেরের হৃদয়ের উত্তাপ তাকেও গলিয়ে ফেলেছিল। প্রতারণা করতে এসে সে সত্যিকার অর্থেই ভালবেসে ফেললো।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে সে বললো, 'আমাকে বিশ্বাস করো। নারী জীবনে একজনকেই মন দেয়। সে মন আমি তোমাকে দিয়ে ফেলেছি। এখন আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই। এ দেহ মন এখন সবই তোমার। তুমি বিশ্বাস করে কাছে টানলেও তোমার, অবিশ্বাস করে দূরে ছুঁড়ে ফেললেও এ তোমারই থাকবে।'

সে যখন এসব বলছিল, তখন তার মনে কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের লেশমাত্র ছিল না। সে তার মনের সত্যিকার

আবেগই প্রকাশ করছিল। মনের টানেই সে আন নাসেরের কাছে চলে এসেছিল।
যদিও আন নাসেরকে ফাঁসানোর জন্যই তারা লিজাকে নিয়োগ করেছিল এবং লিজা সে ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখিয়েছিল, কিন্তু তার মন তাতে সাড়া দেয়নি। সে আন নাসেরকে ভালবেসেই তার কাছে ছুটে আসতো। চাপানো দায়িত্বের কথাও সব সময় স্মরণ থাকতো তার, সে সেই দায়িত্বটুকু পালন করতো নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে।
দায়িত্বের কথা মনে হলেই তার মাঝে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হতো। এক ধরনের দ্বিধা তার পথ রোধ করে দাঁড়াতো। কিন্তু সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে আন নাসেরের কাছেই ছুটে আসতো। কেবল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেন, আরো যে কত রকম বাঁধা তার পথ রোধ করে দাঁড়াতো তার কি শেষ আছে?
আজকে রাতের কথাই ধরা যাক, কাফেলা এখানে তাঁবু স্থাপন করার সময় গুমাস্তগীন এক ফাঁকে এসে লিজার কানে কানে বললো, 'সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তুমি আমার তাঁবুতে একটু এসো। তোমার জাতি যে উত্তম উপহার পাঠিয়েছে আমাদের জন্য, তাকে একটু সম্মানিত করতে চাই। শেখ মান্নান তোমাদের যে বিপদে জড়িয়ে ফেলেছিল, আমি সাহায্য না করলে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হতো তোমাদের। দেখো, আমি তোমাদের কত কৌশলে শেখ মান্নানের কাছ থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলাম। আমাকে কি পুরস্কৃত করবে না তোমরা?'

লিজা এ প্রস্তাবের কোন উত্তর দেয়নি।
গুমাস্তগীন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এসেছিল খৃস্টান অফিসার। সে তাকে বললো, 'লিজা, মহাপ্রভুর অসীম কৃপা, শেষ পর্যন্ত বুড়ো শয়তানের কবল থেকে বেঁচে গেছো তুমি। আমি সময় মত না পৌঁছলে তোমার কপালে যে কি ঘটতো! কারিশমা ঘুমিয়ে গেলে তুমি একটু আমার কাছে এসো। সফরটা আমরা আনন্দময় করে তুলবো।'
এসব দেখেশুনে নিজের সৌন্দর্য ও যৌবনের প্রতি ভীষণ ঘৃণা ধরে গেল লিজার। সে তার তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করলো। কারিশমা ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুম এলো না লিজার। সে উঠে বসলো, আলতো পায়ে বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। গুমাস্তগীন বা খৃস্টান অফিসারের পরিবর্তে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আন নাসেরের দিকে। আন নাসেরও তারই চিন্তায় ও অপেক্ষায় জেগে ছিল।
দীর্ঘ সময় তারা টিলার আড়ালে বসে এভাবে কথা বললো। হঠাৎ এক অভাবিত ঘটনা না ঘটলে হয়তো তারা ভোর পর্যন্ত এভাবেই কথা চালিয়ে যেতো।
টিলার আড়ালে বসে তখনো কথা বলছিল ওরা, লিজা আন নাসেরকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আন নাসের চমকে উঠে বললো, 'লিজা, চুপ! একটু খেয়াল করে শোন তো! তোমার কানে কোন শব্দ আসছে? ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো! শব্দটা মনে হয় এদিকেই ছুটে আসছে।'
'হ্যাঁ! শব্দটা তো স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে।' লিজা বললো, 'চলো,

জলদি সকলকে জাগিয়ে দেই। শেখ মান্নান আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে, অনেক সৈন্য পাঠিয়েছে সে।'

আন নাসের দৌড়ে এক টিলার উপর উঠে গেলো। টিলায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল অনেক মশাল। মশালের আলোগুলো ঘোড়ার গতির সাথে তাল রেখে উপর নিচে দুলছে। অনেক ঘোড়া। অন্ধকার রাত বলে দূর থেকেও আলোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং রাতের নিরবতা ছিন্ন করে তাদের চলার আওয়াজও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আন নাসের দৌড়ে নিচে নেমে এলো। লিজাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলো ঘুমন্ত কাফেলার দিকে। দ্রুত সবাইকে জাগিয়ে তুলে বললো, 'শেখ মান্নানের ধাওয়াকারী বাহিনী ছুটে আসছে।'

ঘুম জাগা লোকগুলো প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও আন নাসেরের চাপা গর্জন শুনেই বুঝে গেলো কি ঘটেছে। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে কমাণ্ডোরা ছুটলো টিলার দিকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো লিজাও।

গুমাস্তগীনের রক্ষীরা কমাণ্ডোদের কাছে দ্রুত হাতে তলোয়ার ও বর্শা সরবরাহ করে নিজেরাও হাতে তুলে নিল হাতিয়ার। সবাই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এমনকি উটের চালকরাও উট ফেলে বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, তাদের কারো কাছে তীর ধনুক নেই। দূর থেকে হামলাকারীদের বাঁধা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। মোকাবেলা করতে হবে সামনাসামনি।

ধাওয়াকারীরা ছিল পনেরো-ষোল জন। ছয়-সাতজনের হাতে মশাল। তারা এসে বিনা বাঁধায় কাফেলাকে ঘিরে ফেললো। একজন গর্জন করে বললো, 'মেয়ে দু'টিকে আমাদের হাতে তুলে দাও। শেখ মান্নান বলেছেন, মেয়ে দু'টিকে দিয়ে দিলে তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে। তোমাদের সাথে কোন সংঘাত বাঁধানোর ইচ্ছে নেই তার। মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিলেই তোমরা নিরাপদে চলে যেতে পারবে।'

আন নাসের ছিল গেরিলা বাহিনীর সুদক্ষ ও চৌকস কমাণ্ডার। গেরিলা যুদ্ধের যেসব কলাকৌশল তার জানা ছিল, সেগুলো জানতো তার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরাও।

ঘোষণা শুনে প্রথমেই সে বললো, 'এই মেয়েরাই আমাদের ধরে এনেছে। ফলে মেয়েরাই আমাদের দুর্গতির জন্য দায়ী। আমরা তোমাদের কেল্লায় ছিলাম। ইচ্ছে করলে তোমরা আমাদের সেখানেই বন্দী করে রাখতে পারতে। কিন্তু তোমরা সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে আমাদের মুক্ত দুনিয়ায় আসার সুযোগ দিয়েছো। এ জন্য আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার দাবী পূরণের স্বার্থে আমরা মেয়েদের হেফাজতের জিম্মা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছি। তোমরা আমাদের চারজনকে তোমাদের ঘেরাওয়ের বাইরে যেতে দাও, তারপর গুমাস্তগীন ও খৃস্টান অফিসারের সাথে আলাপ করে দেখো, তারা তোমাদের মোকাবেলা করবে, নাকি স্বেচ্ছায় তোমাদের দাবী মেনে নেবে?'

তার কথায় যুক্তি ছিল, শেখ মান্নানের সৈন্যরা তাদেরকে ঘেরাওয়ের বাইরে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিল। আন নাসের ও তার তিন সঙ্গী ঘেরাওয়ের বাইরে চলে গেলো।

ধাওয়াকারীদের কমাণ্ডার আন নাসেরের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হলো এই ভেবে যে, প্রতিরোধকারীদের মধ্যে এর ফলে যে ভাঙন সৃষ্টি হলো তাতে সংঘাত ছাড়াই হয়তো মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে এই মেয়েদের সাথে গুমাস্তগীনেরও কোন সম্পর্ক নেই। সে সরে দাঁড়ালে একমাত্র খৃস্টান অফিসার ছাড়া তাদের মোকাবেলায় আর কেউ থাকে না।

তাই সে গুমাস্তগীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আপনি শেখ মান্নানের মেহমান ছিলেন। আপনি জানেন, আপনার সাথে তার কোন সংঘাত নেই। বরং তিনি আপনার একজন শুভাকাঙ্খী ও সহযোগী। তার সাথে আপনার সুসম্পর্ক আছে বলেই তিনি আপনার হাতে আইয়ুবীর চার জানবাজ কমাণ্ডোর মত মূল্যবান বন্দী তুলে দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, বন্দীদের মত আপনিও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই সংঘাত থেকে সরে দাঁড়াবেন। আমাদেরকে ওই খৃস্টান অফিসার ধোঁকা দিয়েছে। প্রতারণা করে মেয়েদের নিয়ে পালিয়ে এসেছে কেল্লা থেকে। কিন্তু তারপরও শেখ মান্নান বলে দিয়েছেন, সংঘাত ছাড়া যদি খৃস্টান অফিসার মেয়েদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেয়, তাহলে নির্বিঘ্নে তাকে চলে যেতে দিও। এবার আপনাদের মতামত চাই, মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন,

নাকি মোকাবেলা করবেন আমাদের?'

গুমাস্তগীন বা খৃস্টান অফিসার কাউকে এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ দিল না আন নাসের। সে তার তিন সঙ্গীকে ইশারা করলো এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো ধাওয়াকারী অশ্বারোহীদের ওপর। পিছন থেকে আক্রান্ত হলো অশ্বারোহীরা, চার কমাণ্ডোর বর্শা মুহূর্তে বিদ্ধ করলো চার অশ্বারোহীকে। পলকে পাল্টে গেল পরিস্থিতি। বর্শা বিদ্ধ চার অশ্বারোহী পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

পরিস্থিতির সুযোগ নিল গুমাস্তগীনের রক্ষী বাহিনী। তারাও বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হামলাকারীদের ওপর। আন নাসের চিৎকার করে লিজাকে বললো, 'এদিকে এসো, জলদি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো!'

ততক্ষণে আন নাসের নিহত এক অশ্বারোহীর ঘোড়া পাকড়াও করে তার ওপর চড়ে বসেছিল। লিজা ছুটে এসে লাফিয়ে পড়লো ঘোড়ার ওপর। লিজাকে নিয়ে ছুটলো আন নাসের। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে বললো, 'শক্ত করে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রাখো।'

শেখ মান্নানের ফেদাইন দলের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো গুমাস্তগীনের রক্ষীদলের। খৃস্টান অফিসার এবং গুমাস্তগীন নিজেও অস্ত্র তুলে নিল হাতে। শেখ মান্নানের বাহিনী হাতের মশাল ফেলে কেউ তলোয়ার, কেউ বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মাটিতে পড়েও মশালগুলো জ্বলতেই লাগলো। আন নাসেরের

তিন সঙ্গী তখনও প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে।

বিশাল মরুভূমির মাঝে ছোট্ট এক টিলার পাশে চলছিল এ লড়াই। এটা কোন মহাসমর নয়, ছোট্ট দুই দলের মাঝে ক্ষুদ্র এক লড়াই। কিন্তু যারা লড়ছিল, তারা উপলব্ধি করছিল, বিশাল সমরের চাইতেও এ লড়াই ভয়াবহ। কারণ বড় লড়াইয়ে পালানোর মওকা পাওয়া যায়, আত্মসমর্পনের সুযোগ থাকে। কিন্তু এখানে সে সবের কোনই বালাই নেই, হয় মারো, নয় মরো।

প্রথম আঘাতের সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল ফেদাইন বাহিনী। চার অশ্বারোহী ছাড়া কোন পক্ষেই আর কেউ মারা যায়নি। এ সময় একটি ঘোড়া তীরবেগে ছুটে যাওয়ার শব্দ পেল ওরা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, আন নাসের এক মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে ছুটলো তিন ফেদাইন সেনা। আন নাসেরের সঙ্গীরা বাঁধা দিল তাদের। যুদ্ধ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

আন নাসের এ সুযোগে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেল। কমাণ্ডোদের বাঁধা ডিঙ্গিয়ে অন্য তিন-চার ফেদাইন সেনা তাদের পাশ কেটে ছুটলো আন নাসেরের পিছনে।

শেখ মান্নান যাদের পাঠিয়েছিল তাদের কেউ কেউ এরই মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। তারা বুঝলো, প্রতিপক্ষকে না মারতে পারলে নিজের মৃত্যু ওরা ঠেকাতে পারবে না। ফলে এবার তারাও মরিয়া হয়ে হামলা চালালো।

দু'পক্ষেই আহত নিহতের সংখ্যা বেড়ে চললো। গুমাস্তগীনের দুই বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল তার চোখের সামনে। এ দৃশ্য দেখার পর সে আর দেরী করেনি, এক ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়ে গুমাস্তগীন প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

ফেদাইনরা আন নাসেরের পিছনের মেয়েটিকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। তাই তারা চেষ্টা করছিল, মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখে কিভাবে আন নাসেরকে ঘায়েল করা যায়। তারা চার অশ্বারোহী মিলে আন নাসেরকে একত্রে আক্রমণ করেছিল এবং চেষ্টা করছিল তাকে ঘেরাও করে ফেলতে।

আন নাসের দক্ষ সৈনিক। সে দুশমনের প্রতিটি চাল ব্যর্থ করে ছুটছিল প্রাণপণে। বার বার তার ঘোড়াকে বাঁচানোর জন্য বিপদজনক মোড় নিচ্ছিল। ফেদাইনরা চাচ্ছিল তাকে আহত বা নিহত করতে, সে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে চলছিল।

বিপদজনকভাবে ঘোড়া চালাচ্ছিল আন নাসের। এমন বেপরোয়া গতির ঘোড়া আর দেখেনি লিজা। আন নাসের যখন চোখের পলকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, লিজার পা তখন ফসকে যাচ্ছিল রেকাব থেকে। আন নাসেরকে জাপটে ধরে লিজা কোন রকমে তার পতন ঠেকিয়ে রাখছিল।

দুই পাশ থেকে দুই ফেদাইন একত্রে আঘাত করলো আন নাসেরকে। আন নাসের চোখের পলকে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার

মুখ। অল্পের জন্য বেঁচে গেল এ যাত্রা। কিন্তু নিজে বাঁচলেও লিজাকে বাঁচাতে পারলো না। সাবধান হওয়ার আগেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল লিজা।

এক ফেদাইন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে জাপটে ধরলো লিজাকে। লিজা হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আন নাসেরের কাছে ছুটে যেতে।

আন নাসের ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলো তার দিকে এবং বর্শা উঁচিয়ে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু ফেদাইন সেনা লিজাকে সামনে বাড়িয়ে দিল, বর্শা সরিয়ে নিল আন নাসের।

একটু আগে যে দুই ফেদাইন সেনা আন নাসেরকে হামলা করেছিল, ফিরে এসে তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আন নাসেরের ওপর। বর্শা ফেলে তলোয়ার বের করলো ওরা। আন নাসেরও তলোয়ার বের করলো। এক ফেদাইন তার তলোয়ার আন নাসেরের ঘোড়ার পেটে সেঁধিয়ে দিল। ঘোড়াটি মুখ থুবরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফেদাইনরাও লাফিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে।

সঙ্গীদের কথা স্মরণ হলো আন নাসেরের। এখন তারা কি অবস্থায় আছে কোন সংবাদ সে জানে না। তাদের যে কেউ এখন তার পাশে থাকলে এ চারজনকে সামাল দেয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু একা সে চার গুপ্তখুনীর সঙ্গে পারবে কি? চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। এখন দুশমন চার থেকে চারশ' হলেও তার কিছু যায় আসে না। জীবনের মায়া ত্যাগ করে সে বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

তার সঙ্গে লড়াই করছিল দুইজন, দুইজন ধরে রেখেছিল লিজাকে। তলোয়ারের অবিরাম ঠোকাঠুকির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু ঢুকছিল না তার কানে।

লড়াই করতে করতে আহত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠলো তার শরীর। আহত হয়েও চিতা বাঘের মত দ্রুত আঘাত হেনে শেষ পর্যন্ত ওদের ঘায়েল করে ফেললো সে।

ওই দু'জনকে ঘায়েল করার পর লিজাকে যারা ধরে রেখেছিল ছুটে এসে তাদের ওপর হামলা করলো আন নাসের। আবার শুরু হলো তরবারির ঝনর ঝন।

লিজা চিৎকার করে বললো, 'আন নাসের, তুমি সরে যাও! আমার জন্য প্রাণ দিও না। দোহাই খোদার, জলদি সরে পড়ো, তুমি একা এবং আহত! ওদের সাথে তুমি কুলিয়ে উঠতে পারবে না।'

কিন্তু এ চিৎকারের দিকে কান দেয়ার মত সময় ছিল না আন নাসেরের। সে পাগলের মত লড়াই করে চললো। লিজা চিৎকারের পর চিৎকার দিয়ে যাচ্ছিল। আন নাসের ধমকে উঠে বললো, 'চুপ করো লিজা! ভয় নেই, এরা তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। সে সুযোগ আমি ওদের দেবো না।'

আন নাসের বাস্তবেও তাই করে দেখালো। ফেদাইনরা লিজাকে নিয়ে যেতে পারলো না। সে দুই ফেদাইন সেনাকে গুরুতর আহত করে মাটিতে ফেলে দিল।

এই যুদ্ধ চলছিল মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। আন নাসেরের সামনে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সে একটি

ঘোড়া ধরে এনে প্রথমে নিজে তাতে চড়ে বসলো এবং লিজাকেও তার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে বললো। লিজা উঠে বসতেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আন নাসের।

লিজা ভেবেছিল, আন নাসের তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সে পালালো না, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। ক্যাম্পের পাশে যে টিলার আড়ালে বসে রাতে গল্পে মেতে উঠেছিল সে আর লিজা, ঘোড়া এগিয়ে চললো সে টিলার দিকে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আন নাসের ও লিজা সেখানে গিয়ে দেখলো, সেখানে পড়ে আছে দু'পক্ষের নিহত সৈন্যদের লাশ। তখনো দু'তিনজন ফেদাইন সৈন্য আহত হয়ে ছটফট করছিল। আন নাসের লাশগুলো দেখলো একে একে। তার তিন সঙ্গীর কেউ পিঠটান দেয়নি। মরার আগ পর্যন্ত তারা যে বীরের মত লড়াই করেছিল তার সাক্ষী পাশে পড়ে থাকা ফেদাইনদের লাশগুলো। খৃষ্টান অফিসারের লাশও পাওয়া গেল। তার লাশটি পড়েছিল গুমাস্তগীনের এক রক্ষীর লাশের ওপর।

কারিশমার লাশ কোথাও পাওয়া গেল না। বুঝতে পারলো না, সে গুমাস্তগীনের সাথে পালিয়েছে, নাকি শেখ মান্নানের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কারণ যুদ্ধে কোন পক্ষ জিতেছে লাশ দেখে তা বুঝতে পারলো না আন নাসের।

'কারিশমা নিখোঁজ। জানি না কি গতি হয়েছে তার।' আন নাসের বললো, 'এখানে তার লাশ নেই।'

লিজা বিহবল হয়ে তাকিয়ে দেখছিল লাশগুলো। অন্তর তার

কাঁদছিল বোবা বেদনায়। সে জানে, এখানকার প্রতিটি লাশের কারণ সে নিজে। একদল মরেছে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসে, অন্যরা মরেছে তার জীবন ও সতীত্ব রক্ষার জন্য। এই লাশগুলোর জন্য তার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছিল।

আন নাসের তার বেদনার্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'লিজা, আল্লাহ যার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছে, কেউ তা খন্ডাতে পারবে না। নিয়তির হাতে বন্দী আমাদের জীবন। এদের জন্য দুঃখ করে কিছু করতে পারবো না আমরা।'

লিজা বেদনা বিধুর কণ্ঠে বললো, 'কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। একটু আগেও এরা জীবিত ছিল, এখন নেই। এদের পরিবর্তে তোমার আমার লাশও তো এখন এখানে পড়ে থাকতে পারতো!'

আন নাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁ, মানুষের জীবন কচুপাতার পানির মতই ক্ষণস্থায়ী। অথচ এই জীবন নিয়ে আমাদের কত বড়াই! ভোগের কি দুর্মর আকাঙ্খা! লোভের ও দম্ভের ছড়াছড়ি!'

'চলো এবার যাওয়া যাক। এখান থেকে দ্রুত সরে পড়া দরকার আমাদের।'

'চলো।'

ওরা আর দেরী করলো না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্রুব তারার সাহায্যে গতিপথ নির্ধারণ করলো আন নাসের। তারপর সঙ্গী সাথী বিহীন ওরা দু'জন আবার নেমে এলো পথে। পিছনে পড়ে রইলো দুঃস্বপ্নের রাত, যে রাতের স্মৃতি ওরা জীবনে

কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আহত ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বাকী রাত এক নাগাড়ে পথ চললো আন নাসের। মাথার ভেতর এলোমেলো চিন্তার ঝড়ো তাণ্ডব। নিয়তি, হ্যাঁ, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! যাদের নিয়ে সে পথে নেমেছিল সভ্যতা ও মানবতা রক্ষার কঠিন শপথ নিয়ে, আজ তারা কেউ নেই সঙ্গে। অথচ যাদের বিরুদ্ধে তাদের এই জাতিগত লড়াই, সেই খৃস্টান ক্রুসেডারদেরই এক গোয়েন্দা সদস্যাকে দুশমনের হাত থেকে বাঁচিয়ে সঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছে সাথে। নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে দলছুট ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে তাদের ঘোড়া। ঘোড়া এগিয়ে যাচ্ছে সামনে আর স্মৃতির পাতা হাতড়ে সে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল পিছনের দিকে।

ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আরো একটি নতুন দিন আসছে পৃথিবীতে। আকাশ ফর্সা হচ্ছে। পূব দিকের আকাশে লালের আভা দেখা যাচ্ছে। সে আভার ভেতর থেকে একটু পরই উঁকি দেবে রাঙা সুরুজ। শুরু হবে নতুন করে জীবনের পথ চলা।

আন নাসের অশ্ব থামালো। লিজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন বলো, তুমি কোথায় যেতে চাও?' সে লিজাকে বললো, 'আমি তোমাকে একা পেয়ে তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নেবো, এমনটি ভেবো না। তুমি নিরূপায় হয়ে আমার সঙ্গ নাও, এটা কখনোই আমার কাম্য নয়।

তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানে পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব।

আইয়ুবীর কোন কমাণ্ডো নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। অতএব তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। যদিও এখন আমি সঙ্গীহারা, তবু তুমি আমার আমানত। আমরা আমানতের খেয়ানত করি না। যতই কষ্ট হোক, এ আমানতের হেফাজত আমি একাই করবো।

যদি বলো, তবে তোমাকে তোমার দেশে পৌছে দিয়ে আসি। আমি এখন একা, অতএব তোমার হেফাজত ছাড়া আমার আর কোন দায়িত্ব নেই, তাই আমার জন্য কোন চিন্তা করবে না!'

ভোরের শীতল বাতাসের চাইতেও আন নাসেরের কণ্ঠ তার কাছে অধিক নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল। গত রাতের সেই আবেগঘন মুহূর্তের আলাপ আর এই উচ্চারণ একই কণ্ঠ থেকে বের হচ্ছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বললো না। তারপর এক সময় মুখ তুলে আকুতিভরা কণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।' লিজা তাকে বললো, 'আন নাসের! আমাকে একটু আশ্রয় দাও।'

ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হলো। আন নাসের তাকিয়ে দেখলো এক অসহায় নারীর বেদনা মলিন মুখ। সে মুখে দুঃসহ কষ্টের প্রলেপ। সেই অকথিত কষ্ট সইতে না পেরে আন নাসের মুখ ফিরিয়ে নিল। ভোরের আলোয় ভাল করে তাকালো চারদিকে।

আন নাসের এলাকাটা চিনতে পারলো। এখানেই কোথাও সে একবার তার কমাণ্ডো বাহিনী নিয়ে রাতে দুশমনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এলাকাটা ছিল মাটির টিলা ও পাথরে

পরিপূর্ণ। উচ্চ ভূমি পেরিয়ে গেলে সামনে স্রোতস্বিনী নদী আছে।

আরেকটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে সামনের উচ্চ ভূমির দিকে হাঁটা ধরলো। তাকে অনুসরণ করলো লিজা। যেতে যেতে উচ্চ ভূমির পরেই সে দেখতে পেল সেই স্রোতস্বিনী নদী। ওরা নদীর কিনারে গিয়ে উপস্থিত হলো।

আন নাসেরের সমস্ত কাপড় রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পানি পান করলো। ঘোড়াকেও পানি পান করালো। আন নাসের তার ক্ষত স্থানগুলো দেখলো, ক্ষত তেমন মারাত্মক ও গভীর ছিল না। অনেক আগেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এই ভয়ে ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করলো না, কি জানি, যদি ধোয়ার পর আবার রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়!

পানি পান করার পর লিজা তার ব্যক্তিগত কাজে একটু আড়াল খুঁজছিল। সে একদিকে হাঁটা ধরে আন নাসের থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। এক টিলার আড়ালে গিয়ে বসে পড়লো সে। এদিকে আন নাসের তার ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে আশপাশে তাকিয়ে দেখলো লিজা নেই। সে নদীর পাড় থেকে উঠে এলো এবং লিজাকে খুঁজতে খুঁজতে টিলার অপর পাশে চলে এলো।

দূর থেকেই সে দেখতে পেলো লিজা সেখানে বসে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কি যেন দেখছে। আন নাসের কিছু না বলে নীরবে এসে তার পিছনে দাঁড়ালো। দেখলো, সেখানে

মানুষের হাড়-হাড্ডি ছড়ানো। মাথার খুলি, বুকের পাজরা, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের হাড় সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। এসব হাড়-হাড্ডির মাঝে পড়ে আছে তলোয়ার ও বর্শা। লিজা একটি মাথার খুলির সামনে বসেছিল। এটা কোন মেয়ে মানুষের মাথা বলে মনে হচ্ছিল। কারণ খুলির পাশেই পড়েছিল মাথার লম্বা লম্বা চুল। কিছু চুল লেগেছিল মাথার খুলির সাথে, কিছু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। বুকের পিঞ্জরায় গোশত, চামড়া কিছুই ছিল না, কিন্তু একটা খঞ্জর তাতে বিদ্ধ ছিল। গলার হাড়ের ওপর পড়ে ছিল সোনার হার। এই দেহ পিঞ্জরের পাশে পাথর চাপা হয়ে পড়ে ছিল উন্নতমানের ছেঁড়া রেশমী শাড়ী কাপড়।

আন নাসের এগিয়ে লিজার আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লিজা নারীর সেই কংকালের দিকেই গভীর মনে তাকিয়ে ছিল। আন নাসের আস্তে করে ডাকলো, 'লিজা!'

লিজা ভয় পাওয়া হরিণীর মত লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং চিৎকার দিয়ে দ্রুত পিছন ফিরলো। আন নাসেরকে দেখে সহসা সে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ভীষণ জোরে জড়িয়ে ধরলো। আন নাসের তাকে তার বুকে আশ্রয় দিল। লিজার দেহ তখন ভয়ে ভীষণ ভাবে কাঁপছে।

০

সে যখন কিছুটা স্বাভাবিক হলো, আন নাসের তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'চিৎকার দিয়েছিলে কেন?'

সে উত্তরে বললো, 'এই লাশ দেখে আমার জীবনের পরিণামের কথা মনে পড়ে গেল।' তখনো তার কণ্ঠে ছিল ভয়ার্ত স্বর। সে বললো, 'তুমি এই কংকালটির দিকে তাকিয়ে দেখো, এটি কোন হতভাগী মেয়ের কংকাল। হয়তো এ মেয়ে আমারই মত পাপিষ্ঠা ছিল। আমার মতই তারও ছিল রূপ ও যৌবনের বাহার। হয়তো এ মেয়ে আমার চাইতেও সুন্দরী ও বিলাসপরায়ণ ছিল। তার রেশমী পোশাক, কণ্ঠের সোনার হার তার সেই বিলাসপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু দেখো তার পরিণাম! প্রত্যেকের জন্যই তো এই পরিণাম অপেক্ষা করছে! কিসের জন্য এত যুদ্ধ, এত সংঘাত, এত রক্তারক্তি? এক সুন্দর ধোঁকার রাজ্যে পড়ে আছি আমরা। স্বপ্ন দেখছি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির। কিন্তু এই কংকাল বলছে, এর সবকিছুই মিথ্যে, সবই মিছে মায়া মরিচীকা। এই সুন্দর ও লাবন্যময় দেহ সৌষ্ঠব, এই মাদকতাময় যৌবনের উচ্ছ্বাস, কিছুই স্থায়ী নয়। সবই ক্ষণিকের মোহ।

এই মেয়েও হয়তো আমারই মত ভেবেছিল, সে চিরকালই নব যৌবনা হয়ে থাকবে। কিন্তু সামান্য এক টুকরো ধারালো লোহা তার সব স্বপ্ন নিঃশেষ করে দিয়েছে।

তার বুকের ওপর যে ছুরিটি বিঁধে আছে, তা দেখো। দেখো তার গলার সোনার হার। এই কণ্ঠহার ও শানিত ছুরি যে জীবনের কাহিনী শোনাচ্ছে, সেটাই তো আমার জীবন! আর ওই যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে মাথার খুলি, পড়ে আছে তলোয়ার ও বর্শা, সেখানে কি তুমি তোমার জীবন দেখতে পাও না?

কোনদিন আমি ইতিহাসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনিনি। আজ এই মেয়ের কংকাল দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ লাশ ও এ দেহ পিঞ্জরা আমারই।

এই কংকালে আবার মাংস ও চর্ম লাগিয়ে দিলে সেখানে আমার চেহারাই ফুটে উঠবে।

আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম এক শকুনকে, সে আমার চেহারা থেকে টেনে বের করছে চোখ। এক নেকড়েকে দেখলাম, সে আমার উজ্জ্বল গোলাপী গাল ছিঁড়ে খাচ্ছে। এসব মরাখেকোদের তৃপ্তিকর আহারের জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল?

এই কংকাল চিৎকার করে বলতে চাইছে, 'লিজা! এই তোমার শেষ পরিণাম! ভাল করে দেখে নাও।' কংকালের সে বিকট চিৎকার শুনে এবং তার বিভৎস রূপ দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম।'

আন নাসের নিবিষ্ট মনে শুনলো লিজার কথাগুলো। তার মনে হলো, সে তো সত্য কথাই বলেছে! যেখানে ফেদাইনরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, কিছুদিন পর সেখানে গেলে আমরা তো একই দৃশ্য দেখতে পাবো!

আন নাসের লিজার কথায় সায় দিয়ে বললো, 'সত্যি কথাই বলেছো লিজা। যেখানে আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম, ক'দিন পর সেখানে গেলে আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাবো। লাশের কংকাল, মাথার খুলি, তলোয়ার ও বর্শা। হয়তো সেখান থেকে কিছু দূরেই পাওয়া যাবে কারিশমার কংকাল। তার বুকেও

দেখতে পাবো এমনি ভাবে বিদ্ধ হয়ে আছে ছুরি।'

'কিন্তু তুমি কি জানো, এই সব মেয়েরাই নারী জাতির কলংক! সভ্যতার বিনাশ সাধনে এদেরকে ব্যবহার করে মানবতার শত্রুরা। আমিও এই জঘন্য পেশায় নিয়োজিত এক নারী। যদি আমি এ পেশা পরিবর্তন না করি, হয়তো একদিন এমন নির্জন মরুভূমিতে শিয়াল, শকুন ও নেকড়ে আমার মাংস এমনি করে কুরে কুরে খাবে। যে রূপ নিয়ে আমি গর্ব করি, যাকে পাওয়ার জন্য মানুষ অকাতরে অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না, যাকে পাওয়ার জন্য এতগুলো মানুষ আত্মাহুতি দিল, এই তো তার পরিণতি!'

আন নাসের বললো, 'কিন্তু মানুষ এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। নিজেদের ধ্বংস ও অধ:পতন লক্ষ্য করে দেখে না। এর আগেও এ পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ ও অহংকারী রাজা-বাদশাহ রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য ও শক্তির প্রদর্শনা করে বেড়িয়েছে, আজও বেড়াচ্ছে। গর্ব, অহংকার ও দম্ভে মদমত্ত মানুষ ভুলে গেছে তার পরিণামের কথা।'

'মানুষ এ ভুল করে তার উপলব্ধিহীনতার জন্য, যেমন এতদিন আমি করে এসেছি। কিন্তু এখন আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। আমার মৌলিক সত্ত্বাকে জানতে পেরেছি।' লিজা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো, 'আন নাসের, তুমিও শুনে নাও, তোমাকেও খোদা পৌরুষদীপ্ত এক অনুপম সৌন্দর্য ও শক্তি দান করেছেন। তোমাকে যে নারী একবার দেখবে সেই তোমাকে পাওয়ার জন্য পাগল হবে। সাবধান হও, তুমিও দেখে

নাও তোমার পরিণতি।'

সে এমন ভঙ্গীতে কথা বলছিল, যেন তার উপর জ্বীনের আছর পড়েছে। তার চঞ্চল হরিণীর চাপল্য ও চেহারা থেকে দুষ্টুমীর ভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে দুনিয়াত্যাগী সন্নাসিনীর মত ভাব-গম্ভীর স্বরে কথা বলছিল। আন নাসের অভিভূত হয়ে তাকিয়ে দেখছিল লিজার এ নতুন রূপ। বললো, 'লিজা, আমি আমার পৌরুষ নিয়ে গর্ব ও অহংকার করি না। আমি এই শক্তি সেই কাজেই লাগাতে চাই, যে কাজ আল্লাহর পছন্দ। এ উদ্দেশ্যেই আমি কমাণ্ডো বাহিনীতে নাম লিখিয়েছি।

এই কংকাল তোমার হুশ ফিরিয়ে দিয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। কিন্তু মনে রেখো, জীবন যেমন কেবল ভোগের নাম নয়, তেমনি আশা ও স্বপ্নহীনতার নামও জীবন নয়। এ কংকাল দেখে তুমি মারাত্মক রকম ধাক্কা খেয়েছো, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে তোমার, এই উভয় প্রান্তিকতা থেকেই ফিরে আসতে হবে তোমাকে। চলো উঠা যাক।'

ওরা ওখান থেকে উঠে এলো। ফিরে এলো নদীর পাড়ে। হাঁটতে হাঁটতে লিজা বললো, 'আন নাসের, তোমাকে আমি এমন কিছু কথা শোনাতে চাই, যা তুমি আমার কাছ থেকে কখনো আশা করোনি। আমিও ভাবতে পারিনি, এসব গোপন কথা কখনো আমি তোমার কাছে প্রকাশ করবো। কিন্তু আজ আমি উপলব্ধির এক নতুন দিগন্তে এসে পড়েছি। লোভ ও স্বার্থের চাইতে সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া এখন আমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তুমি কি একটু মন দিয়ে আমার

কথাগুলো শুনবে?'

বিস্মিত আন নাসের লিজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি কথা লিজা!'

'আমি তোমাকে বলে দিতে চাই, আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনেক গোপন কথা, যা আমি না বললে কোনদিন তুমি জানতে পারতে না।'

সে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়েই এক পাথরের ওপর বসে পড়লো। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে আন নাসেরও বসলো আরেক পাথরে।

লিজা কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলো নদীর দিকে, যেন কি বলবে গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর কিছু না বলেই সে তার হাত দুটো নিয়ে গেল গলায়। নিজের কণ্ঠহারটি আকড়ে ধরলো, যে হারে মূল্যবান হীরা ও জওহর লাগানো ছিল।

সে হারটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে জোরে টান দিল। হারটি ছিড়ে চলে এলো তার হাতে। লিজা দেরী না করে সামনের স্রোতস্বিনী নদীতে ছুঁড়ে ফেললো হারটি।

লিজা আঙ্গুল থেকে তার মূল্যবান হীরার আংটিটিও খুলে ফেললো। সেটাও নদীতে ফেলে দিল। বিস্মিত আন নাসের বলে উঠলো, 'এসব কি হচ্ছে? কি করছো তুমি? গলার হার, হাতের আংটি এসব ফেলে দেয়ার মানে কি?'

'এসবই সকল বিভ্রান্তির মূল। এই সম্পদ ও সোনার মোহই আমাকে এই পঙ্কিল পথে টেনে নামিয়েছে। এগুলোই আমার জীবনের অনিষ্টের মূল।' লিজা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,

'আন নাসের! তুমি জানো না, আমি কত বড় শঠ, প্রতারক। প্রতারণা করার জন্য আমাদেরকে নানা রকম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমরা মানুষের চোখে মায়ার অঞ্জন মেখে তাকে বিভ্রান্ত করি। মরুভূমির মরিচীকার মতই আমরা স্রেফ ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নই। আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, আমি তোমাকেও ধোঁকা দিতে গিয়েছিলাম।'

'ভালবাসার নাম করে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছিলে!' প্রশ্ন নয়, বিস্ময় ঝরে পড়লো আন নাসেরের কণ্ঠ থেকেও।

'না, নাসের, না!' ব্যাকুল কণ্ঠে বললো লিজা, 'তোমাকে দেখেই আমার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ভালবাসার টানেই তোমাকে বলেছিলাম, পালাতে চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু পরে তোমার সাথে ভালবাসার অভিনয় করার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। দায়িত্ব পাওয়ার পর তোমার সাথে মিশতে গিয়ে আমি ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। কখনো মনে হয়েছে, ভালবাসার টানেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি, কখনো মনে হয়েছে, ভালই তো অভিনয় চালাচ্ছি!

ফেদাইনরা যদি আমাদের উপর আক্রমণ না চালাতো এবং এই কংকাল আমার চোখ খুলে না দিত, তবে তুমি জানতেও পারতে না, ভালবাসার নাম করে আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

লিজার কথা শুনে আন নাসের এতটাই বিস্মিত হয়েছিল যে, সে যেন বোবা হয়ে গেলো। তবু কোন রকমে ঢোক গিলে বললো,

'কি সব আবোল তাবোল বকছো! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'না, নাসের, মাথা আমার খারাপ হয়নি। আজ যদি এ কংকাল আমার হুশ ফিরিয়ে না দিত তবে তোমাকে আমি এমন জায়গায় নিয়ে যেতাম, যেখানে তোমার আমার ভালবাসারই সমাধি হতো না, তোমার জীবনও ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে যেতো! তুমি গুমাস্তগীনের এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে গিয়ে বেঁচে গেছো। এখন আমি আর কোন মিথ্যা বলবো না। তোমাকে দিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়। পরিকল্পনা সফল হলে ইতিহাসে তুমিই চিহ্নিত হতে আইয়ুবীর খুনী হিসাবে।'

স্তম্ভিত আন নাসের বললো, 'তা কি করে সম্ভব! আমি আইয়ুবীর জন্য জান দেয়ার সংকল্প করে পথে নেমেছি, আমি তাকে হত্যা করতে যাবো কেন?'

'সে অনেক কথা। তাহলে শোন, আইয়ুবীকে হত্যা করার লোক ভাড়া করার জন্য হারান থেকে গুমাস্তগীন এসেছিল আছিয়াত দুর্গে। শেখ মান্নান তাকে বললো, 'চারজন ফেদাইন খুনীকে এরই মধ্যে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি এরা সফল হয় ভাল, কিন্তু যদি ব্যর্থ হয়, তবু আমার করার কিছু নেই। আমি আমার শ্রেষ্ঠ খুনীদেরকেই আইয়ুবীর পিছনে লাগিয়েছি, এরা ব্যর্থ হলে বেহুদা অন্য কোন ফেদাইনকে তার পেছনে লাগিয়ে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় করতে চাই না।'

গুমাস্তগীন তাকে বললো, 'তুমি আমাকে নিরাশ করো না।

আমি অনেক আশা ভরসা করে তোমার কাছে এসেছি।'

গুমাস্তগীনের কথা শুনে শেখ মান্নানের মাথায় নতুন বুদ্ধি আসে। সে তোমাদেরকে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তার কাছে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ সময় আমাদের খৃস্টান অফিসারও সেখানে উপস্থিত হয়। সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খুশী হন এবং তোমাদের মগজ ধোলাইয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত দরদাম ঠিক করে মূল্য বুঝে পেয়ে তিনি তোমাদেরকে তুলে দেন গুমাস্তগীনের হাতে।

সেই খৃস্টান অফিসারই আমার ওপর দায়িত্ব দেয় তোমাকে আমার রূপের ফাঁদে আটক করার। ভালবাসার অভিনয় করে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার হুকুম পেয়ে সাথে সাথেই আমি কাজে নেমে পড়ি। আমার

তোমাকে তৈরী করা।'

'না, এটা কখনও সম্ভব নয়। আমি সুলতান আইয়ুবীর ছায়াকেও সম্মান করি। আমাকে দিয়ে কোনদিনই তুমি এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারতে না।' আন নাসের বললো, 'দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে দিয়ে আমাদের নেতা, ক্রুসেডের বিরুদ্ধে অকুতোভয় বীর, মহানায়ক গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কোন ক্ষতি করাতে পারতো না। আমি কখনোই নিজেকে এতটা নির্বোধ মনে করি না।'

লিজা একটু হাসলো। বললো, 'তুমি কতটা নির্বোধ আর বুদ্ধিমান সেটা এখন আর বিচার করতে চাই না। তবে আমি চাইলে ইস্পাতকেও গলিয়ে পানি করে দিতে পারি। তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করো না। নিজের ওপর তোমার কতটা নিয়ন্ত্রণ আছে ভালই জানা আছে আমার।

তোমার ধর্ম, তোমার এতদিনের শিক্ষা ও আচার কি নিশুতি রাতে অচেনা মেয়ের সাথে গোপনে দেখা করার অনুমতি দেয়? কিন্তু তুমি তা করোনি? যেভাবে এই অনুচিত কাজকে তুমি বাস্তবে করেছো, সেভাবেই তোমার ইচ্ছার বিপরীত আইয়ুবীকে হত্যার কাজও তুমি নির্বিঘ্নে করে দিতে, যদি আমি চাইতাম।'

'সত্যি আমি বিবেকের ওপর আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে বড় অন্যায় করে ফেলেছি। আমার ঈমানকে তুমি দুর্বল করে দিয়েছিলে। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছি, এ জন্য আমি অনুতপ্ত।'

'আমার মনের মধ্যে যে অপরাধবোধ ছিল, সত্যকে প্রকাশ করে তা থেকে মুক্তি চাচ্ছিলাম আমি। এখন আমার মনে আর কোন গ্লানি নেই। তোমার কাছে এ সত্যটুকু প্রকাশ করতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পেতাম না। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। দোয়া করো, যেন মৃত্যুর আগে আর কখনো এমন জঘন্য পাপ আমাকে করতে না হয়।'

'ক্ষমার মালিক আল্লাহ। অন্ধকার থেকে যদি আলোর ভুবনে তুমি আসতে চাও, আমি তোমাকে স্বাগতম জানাবো। দোয়া করি, বিবেকের পথ ধরে যেনো চলতে পারো চিরদিন।'

•

'তুমি কি জানো, এক সময় আমি সাইফুদ্দিনের কাছেও থেকেছি? আমি এক অপবিত্রা ও পাপিষ্ঠা মেয়ে। এই পাপ নিয়ে আমি কি আলোর পথে আসতে পারবো? আমাদের মত পাপী মেয়েদেরও কি অধিকার আছে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করার?'

'আমাদের ধর্ম তো তাদের জন্যই, যারা এখনো আলোকের সন্ধান পায়নি। মুক্তির রাজপথ থেকে যারা দূরে, তাদেরকে মুক্তি পথের সন্ধান দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের নবী। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন– সমস্ত বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। কোন বিশেষ গোষ্ঠী, গোত্র বা বর্ণের জন্য তিনি আসেননি। আল্লাহর দেয়া সূর্য যেমন সবাইকে আলো দেয়, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান তেমনি সবার জন্য। সে বিধানের নাম ইসলাম। সে বিধানটি যেখানে লিপিবদ্ধ আছে তাকে বলা হয় কোরআন। আর সে বিধান মত যারা জীবন চালায় তাদের বলা হয় মুসলিম। মুসলিম মানে অনুগত, তুমি আল্লাহর আনুগত্য কবুল করে নিলেই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তোমার স্রষ্টার দেয়া বিধানের আনুগত্য করবে তুমি, কার সাধ্য আছে তোমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে?'

লিজা বললো, 'আমি যদি বিশুদ্ধ মনে ইসলাম গ্রহণ করে নেই, আল্লাহ হয়তো আমাকে গ্রহণ করে নেবেন। কিন্তু জেনে শুনে তুমি কি আমার মত একজন পাপীকে তোমার জীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে?'

'তুমি যদি বিশুদ্ধ মনে তওবা করে নিজেকে আল্লাহর কাছে

সোপর্দ করে দিতে পারো, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমার পূর্ববর্তী সকল গুণাহ তিনি মাফ করে দেবেন। যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে নিজের পছন্দনীয় বান্দী করে নেবেন, তাকে অপছন্দ করা এবং গ্রহণ না করা তো আমার জন্য পাপ ও অপরাধ হবে!'

'আন নাসের!' লিজা আবেগ মথিত কণ্ঠে বললো, 'তাহলে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করছি।'

'আমিও তোমাকে আমার জাতির এক কন্যা হিসাবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে জীবন সঙ্গী করার সিদ্ধান্ত আমি এ মুহূর্তে নিতে পারবো না। আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক কমাণ্ডো সেনা। তাঁর অনুমতি ছাড়া জীবন সঙ্গী বাছাই করার মত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করতে পারি না।'

'তেমন সিদ্ধান্ত নিতে আমি তোমাকে কখনোই বাধ্য করবো না। তুমি আমাকে তোমার জাতির এক কন্যা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছো, এতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি যেনো সঠিকভাবে আল্লাহর পথে চলতে পারি, এ ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য ও পরামর্শ চাই।'

'অন্তর থেকে পাপের বোঝা নামিয়ে দাও! যখন থেকে তুমি ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছো, তখন থেকেই বিরাট এক দায়িত্ব এসে কাঁধে চেপেছে তোমার। এ বিশ্ব জাহানের একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক মহান রাব্বুল আলামীনের বিশ্বস্ত

গোলাম হিসাবে আল্লাহ তোমাকেই তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন। অতএব এখন থেকে আল্লাহর এ দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। এ পৃথিবী আল্লাহর বাগান। তুমি এ বাগানের মালি। অতএব সেইভাবে জীবন যাপন করো, যাতে তোমার চেষ্টা ও সাধনায় আল্লাহর এ বাগানের সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধি পায়।'

এ সময় হঠাৎ লিজা উঠে দাঁড়ালো। এক ধরনের ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততা ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। আন নাসের প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তার দিকে। বললো, 'কি হয়েছে লিজা!'

লিজা চেহারায় সেই ব্যগ্রতা ধরে রেখেই বললো, 'তোমার কি জানা আছে, ফেদাইনরা সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে গেছে? তাদের এ হত্যা পরিকল্পনা কেমন করে বাস্তবায়ন করবে, তা কি তুমি জানো?'

'না, কিছুই জানি না। লিজা, তুমি কি নিশ্চিত যে, চারজন ফেদাইন খুনী সুলতানকে হত্যা করার জন্য সত্যি রওনা হয়ে গেছে?'

লিজা উত্তর দিল, 'একশো ভাগ। তবে আমাকে শুধু এ পর্যন্তই জানানো হয়েছে, সেখানে চারজন ফেদাইন খুনীকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা কি পোশাকে গেছে, কিভাবে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, সে সব আমি কিছুই জানি না।'

'আমাকে এখন উড়ে গিয়ে তুর্কমান পৌছাতে হবে।' আন নাসের বললো, 'সবার আগে সুলতানকে এবং তার রক্ষী বাহিনীকে সতর্ক ও সাবধান করতে হবে।'

আন নাসেরের ভাবালুতা কেটে গেল। সে আবার পুরোদস্তুর আইয়ুবীর একজন কমাণ্ডো ও কমাণ্ডোদের দলনেতা হয়ে উঠলো, যদিও তখন তার আর কোন সাথী বেঁচে ছিল না।

সে লিজাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঘোড়ার গতি তীব্র হওয়ায় বার বার তার শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল লিজা। কিন্তু এমন সুন্দরী ও যুবতী নারীর স্পর্শ তার মনে কোনই প্রভাব ফেলতে পারছিল না। তার চোখের সামনে তখন ভাসছিল শুধু সুলতান আইয়ুবীর হাসিমাখা প্রশান্ত ছবি।

আশঙ্কার দাবানল তার পেরেশানী বাড়িয়ে তুলছিল। সে মনে মনে শুধু প্রার্থনা করছিল, 'হে আল্লাহ, আমাকে তুমি তোমার কাছে তুলে নাও, তার আগে শুধু এই খবরটা একবার সুলতানকে পৌঁছানোর সুযোগ দাও আমায়।'

আন নাসের এখন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাইরে আর কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। যৌবনের চাহিদা, ভালবাসার আবেগ সবকিছুই তার অন্তর থেকে হারিয়ে গেছে। এমনকি তার জৈবিক চাহিদা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও যেন সে ভুলে গেছে।

অন্যদিকে লিজার মধ্যেও ঘটে গেছে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। মানুষের মন কত দ্রুত বদলে যেতে তাকে না দেখলে তা বুঝার উপায় নেই। চির চঞ্চলা লিজার মধ্যে এখন আর চাঞ্চল্যের ছিটেফোটাও অবশিষ্ট নেই। ভাবগম্ভীর লিজাকে দেখলে মনে হবে তার আত্মাটাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

প্রতিটি নারীর মধ্যে নারীত্বের যে সহজাত বোধ কাজ করে সে উপলব্ধি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। রেলিং ধরে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা, আর এক সুঠাম ও তেজস্বী যুবককে জড়িয়ে ধরে থাকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এই বোধটুকুও তার মধ্যে কাজ করছিল না।

এক যুবকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে বসে আছে এক যুবতী, এ বোধ তখন ওদের কারো মাঝেই ছিল না। আন নাসের ফিরে গিয়েছিল তার অতীত ভূমিকায় আর লিজা আন নাসেরের কথা ও কাজে এবং সঙ্গীদের পরিণতি ও কংকাল দর্শনে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, কোন উপদেশ দাতা সারা জীবন উপদেশ দিয়েও তার মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে পারতো না, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেই অভাবিত পরিবর্তন এমনিতেই ঘটে গিয়েছিল। আন নাসেরের চোখের জ্যোতি যেন তাকে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে বলছিল, 'যদি পবিত্র জীবন-যাপন করতে চাও, তবে সে জীবন একমাত্র ইসলামই তোমাকে উপহার দিতে পারে।'

০

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এজাজ দুর্গের অধিপতির উত্তর শুনে এবং দূতের সাথে তার খারাপ ব্যবহারের খবর পেয়ে খুবই মর্মাহত হলেন। তার এ ব্যবহারে তিনি কেবল মর্মাহতই হলেন না, যথেষ্ট রাগান্বিতও হলেন। উপলব্ধি করলেন, এর একটি সমুচিত জবাব দেয়া ফরজ হয়ে গেছে।

তিনি তখনই সে কেল্লা দখল করার সংকল্প করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হলব শহরও অবরোধ করার পরিকল্পনা করলেন।

বুজা ও মুমবাজ দুর্গ বিনা বাঁধায় দখল হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার সেনাবাহিনী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে সুলতানের বাহিনীতে শামিল হয়ে গিয়েছিলো। সুলতান তার বাহিনীর পরীক্ষিত সৈন্যদেরকে সেই দুই কেল্লার দায়িত্বে পাঠিয়ে সেখানকার সেনাদলকে নিজের বাহিনীর সাথে একীভূত করে দিলেন।

এরপর তিনি এজাজ ও হলবে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করলেন। অভিযান চালানোর আগে ওখানকার অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জন্য তিনি তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ বাহিনীকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন। বাহিনীর সাথে পাঠালেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, যাতে তিনি অভিযান চালানো ও হলব অবরোধের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন।

গোয়েন্দা বাহিনী যথাসময়ে সুলতানের কাছে হলব ও এজাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করলো।

সুলতান আইয়ুবীর এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী অভিযান। তিনি এ অভিযানে তার নিজস্ব পতাকা সঙ্গে না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের দেহরক্ষীদের বললেন, 'এ অভিযানে আমাকে সঙ্গ দেয়ার কোন দরকার নেই তোমাদের।'

এরপর তিনি তার ঘোড়া পাল্টালেন। তার নিজস্ব ঘোড়ার রং ছিল সাদা। সেই সাদার মধ্যে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল লাল রংয়ের ডোরাকাটা দাগ। শত্রুরা এ ঘোড়াটিকে ভালমতই চিনতো।

এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, শত্রুরা যাতে তাকে চিনতে না পারে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখন কোথায় আছেন, এ প্রশ্নের উত্তর যেন জানা না থাকে কারো।

গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পথ চলতে লাগলেন তিনি। নিজেও মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, রিপোর্টগুলো ঠিক আছে কিনা। যাত্রা পথের সকল বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো সচক্ষে দেখে, ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন তিনি, যাতে যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ছোটখাটো বিষয়গুলোও দৃষ্টি না এড়ায়।

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যেসব উপদেষ্টা ও সেনাপতিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তারা তাঁকে বার বার সতর্ক করলো, 'দয়া করে আপনি দেহরক্ষী ছাড়া একা কোথাও যাবেন না।' কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয় বলে এ প্রসংগটিকে তিনি কোন রকম আমলেই নিলেন না।

আসলে এজাজের ব্যবহারে তিনি এতটাই অসন্তুষ্ট ও ক্ষীপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তার মাথায় রীতিমত খুন চেপে গিয়েছিল। তিনি শেষবারের মত তার মুসলমান শত্রুদের নাকানি-চুবানি খাওয়াতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

তিনি এখন যে এলাকাটি অতিক্রম করছিলেন তা সর্বত্র টিলা ও পাহাড়ী উপত্যকায় পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও বৃক্ষের ছায়া আছে। কোন কোন স্থানে আবার গভীর খাদ। এলাকাটি দুর্গম ও সত্যি ঝুঁকিপূর্ণ। এমন এলাকায় দেহরক্ষী ছাড়া সুলতান

আইয়ুবীর একাকী চলাফেরা ছিল খুবই আশংকা ও বিপদের কারণ।

'সুলতানে মুহতারাম!' তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ এ ভয়ানক অঞ্চলে পৌঁছার পর এক সময় সুলতানকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন. 'আল্লাহ না করুক, আপনার উপর যদি ফেদাইন ও খৃস্টানদের হত্যা ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যায়, তাহলে আপনার হয়তো কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে না, কিন্তু মুসলিম মিল্লাত অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তারা তাদের রাহবার হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়বে। আপনার মত নেতা পাওয়া আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার।

যদি কখনো এমন দূর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন আমরা জাতির কাছ মুখ দেখানোর যোগ্য থাকবো না। পরবর্তী বংশধররা আমাদের 'সুলতান আইয়ুবীর হেফাজতের জিম্মা কেন তোমরা পালন করতে পারোনি?'

'যদি আমার মৃত্যু কোন ফেদাইন বা ক্রুসেডারের হাতে আল্লাহ মঞ্জুর করে থাকেন, তবে সে মৃত্যুকে আমি ঠেকাবো কেমন করে?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'দেশের শাসক যদি তার জীবন রক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, তবে তিনি দেশ ও জাতির হেফাজত করতে পারবেন না। যদি আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসে থাকে, তবে আমার কাজ দ্রুত শেষ করতে দাও। আমাকে রক্ষীদের হাতে বন্দী করে রেখো না। আমার উপর বাদশাহীর বিলাসিতা চাপিয়ে দিও না। তোমরা তো জানো আমার ওপর আন্তর্জাতিক

গুপ্তঘাতকরা কতবার আঘাত করেছে। আল্লাহ আমাকে প্রত্যেকবার বাঁচিয়েছেন, এখনও তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।'

তাঁর নিজস্ব রক্ষী বাহিনী তাঁর নিরাপত্তার জন্য বরাবরই উৎকণ্ঠিত ছিল এবং নিরাপত্তা রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু দেখা গেছে সবক'টি আক্রমণের সময়ই তিনি ছিলেন একা।

সুলতান আইয়ুবী কখনোই নিজের নিরাপত্তার বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তিনি তার নিজস্ব রক্ষীদের কোন এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে একাই টিলা বা উপত্যকার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। হাসান বিন আবদুল্লাহ বিষয়টি জানতেন বলে তিনিও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছিলেন। দূরে থাকলেও দেহরক্ষীরা সুলতান আইয়ুবীর উপর দূর থেকেই দৃষ্টি রাখতো।

কেউ জানতো না, কিছুদিন থেকেই চারজন খুনী আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য সে এলাকায় এসে আস্তানা গেড়েছিল এবং পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে সুলতানকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিল। এরাই সেই চার ফেদাইন খুনী, যাদের সম্পর্কে আছিয়াত দুর্গে শেখ মান্নান গুমাস্তগীনকে বলেছিল।

এখানে এসেই ওরা পরিকল্পনা করলো, যেহেতু এটা যুদ্ধ কবলিত এলাকা, তাই শরণার্থী হয়ে ওরা সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাবে এবং সুযোগ মত তাকে হত্যা করবে।

কিন্তু সুলতানের কাছে এসে তাদের আফসোসের সীমা রইলো না। তারা যখন দেখলো সুলতান আইয়ুবী রক্ষী ছাড়া একাই ঘোরাফেরা করেন, তখন তারা এই বলে আফসোস করতে

লাগলো, 'হায়, যদি সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে আসতাম! তাহলে সুযোগ মত তীর মেরেই তাকে শেষ করে দিতে পারতাম।' কিন্তু তারা সঙ্গে করে তীর-ধনুক আনেনি, কেননা তাতে ধরা পড়ার ভয় ছিল। তাদের কাছে যদি একটি ধনুকও থাকতো তবুও গোপন স্থান থেকে নিশানা করতে পারতো। কেননা সেখানে লুকানোর মত যথেষ্ট জায়গা ছিল এবং তীর মেরে সহজে পালিয়ে যাওয়ারও সুযোগ ছিল। তারা তাদের লম্বা খঞ্জরের বাটে হাত বুলাতে বুলাতে এই আফসোসই করছিল।

ওদিকে আন নাসের লিজাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দ্রুত ছুটছিল তুর্কমানের দিকে। সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে চার ফেদাইন খুনী রওনা হয়ে গেছে, এ কথা শোনার পর কেউ জানতো না, কিছুদিন থেকেই চারজন খুনী আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য সে এলাকায় এসে আস্তানা গেড়েছিল এবং পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে সুলতানকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিল। এরাই সেই চার ফেদাইন খুনী, যাদের সম্পর্কে আছিয়াত দুর্গে শেখ মান্নান গুমাস্তগীনকে বলেছিল।

ঘোড়ার গতি আর বাড়াতে পারছিল না। তাছাড়া রাস্তায় ঘোড়ার বিশ্রাম এবং পানি পান করানোর দিকেও তাকে নজর রাখতে হচ্ছিল।

ওদিকে সুলতান আইয়ুবী নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখেয়াল হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এজাজ দুর্গের দিকে। চার খুনী গোপনে তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

সুলতান যে এলাকা অতিক্রম করছিলেন, সে এলাকায় কোন সৈন্য ছিল না, কোন জনবসতিও ছিল না। ফেদাইনরা বন্য পশুর শিকারীর বেশে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললো।

সূর্য অস্ত চলে গেল, আন নাসের লিজাকে নিয়ে তখনো ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে ঘোড়াটি কাহিল হয়ে পড়লো। ঘোড়াটির চলার গতি ক্রমে ধীর হয়ে আসতে লাগলো। আন নাসের বুঝতে পারলো, ঘোড়াকে যতই তাড়া করা হোক, সে আর দ্রুত চলতে পারবে না।

আন নাসের বোঝার ভার কমানোর জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললো।

রাত বাড়তে লাগলো, কিন্তু সে চলা বন্ধ করলো না। লিজা তিন চার বার আন নাসেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'আমি আর ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারছি না। আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন আলাদা হয়ে গেছে।'

সবারই তখন বিশ্রাম জরুরী হয়ে পড়েছিল। ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আন নাসের নিজেও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু সে থামলো না, বরং লিজাকে বললো, 'তোমার ও আমার প্রাণের চেয়ে সুলতান আইয়ুবীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী। আমি যদি থেমে যাই, আর কখনো শুনতে পাই, সুলতান আইয়ুবী নিহত হয়েছেন, আমি মনে করবো, ফেদাইনরা নয়, সুলতান আইয়ুবীকে আমিই খুন করেছি।'

লিজা আর কোন কথা বললো না, সে অর্ধ চেতন অবস্থায় ঘোড়ার পিঠ খামচে পড়ে রইলো।

৩

সারা রাত এভাবেই পথ চললো ওরা, কোথাও থামলো না। সকাল হলো। আন নাসের তখনো পা টেনে টেনে পথ চলছে। লিজা ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে শুয়ে আছে।
ঘোড়াটিও পা টেনে টেনে এগুচ্ছিল, হঠাৎ সামনে এক স্থানে ঘাস ও পানি দেখে দাঁড়িয়ে গেল। লিজা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পথ চলছিল, ঘোড়াটি থামতেই হঠাৎ গতি পড়ে যাওয়ায় সে চমকে উঠে বসে পড়লো এবং আন নাসেরের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললো, 'দেখো, খোদার কসম লাগে, এই অবোধ প্রাণীটিকে আর এভাবে টেনে নিও না! একে কিছু খেতে দাও, পানি পান করাও!'
আন নাসের ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিল। লিজাকে ধরে নামালো ঘোড়া থেকে। ঘোড়াটি পানি পান করে তাজা ঘাসের ভেতর মুখ ডুবিয়ে দিল।

ঘোড়াটির পেট তখনো ভরেনি, আন নাসের আবার লাগাম ধরে ঘোড়াটিকে চলতে বাধ্য করলো। ঘোড়াটির দৌড়ানোর ক্ষমতা না থাকলেও প্রভুর ইচ্ছা সে বুঝতে পারলো, চলতে লাগলো ঘোড়া।
লিজার চেহারা দুঃখী মেয়েদের মত করুণ ও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না। আন

নাসেরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দানাপানি খাওয়ায় ঘোড়াটি কিছুটা সবল হয়ে উঠলো, আন নাসের লিজাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো।

আন নাসের জানতো না, সুলতান আইয়ুবী এখন কোথায়। সে তুর্কমানের দিকে যাচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবী সামনে অগ্রসর হতে হতে 'কোহে সুলতান'এ পৌঁছে গেলেন। তারপর তিনি সেখান থেকেও অগ্রসর হতে লাগলেন।

আন নাসের চলতে চলতে কোহে সুলতানের কাছে চলে এসেছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, সামনেই কোহে সুলতানের উপত্যকা।

সে তুর্কমান পৌঁছার চিন্তাতেই বিভোর ছিল। কেমন করে তাড়াতাড়ি তুর্কমান গিয়ে পৌঁছবে, এ চিন্তা তার শারীরিক অবসাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য মাথার অনেক উপরে উঠে এসেছে, আন নাসের ঘোড়াকে তাড়া করলো।

সে সময় সুলতান আইয়ুবী একটি উঁচু পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করছিলেন। তিনি এক জায়গায় থেমে অঞ্চলটি জরিপ করে দেখছিলেন।

সঙ্গী সাথীদের এক স্থানে রেখে একাই অন্য দিকে দেখতে গেলেন তিনি। কি করে কোন পথে বাহিনী পরিচালনা করবেন তারই পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে একটি টিলার উপরে আরোহণ করলেন এবং তার নক্সা এঁকে নিতে লাগলেন।

চারজন ফেদাইন উপত্যকার পাশে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে

সুলতান আইয়ুবীকে লক্ষ্য করছিল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলেন।

'তাঁকে নিচে নামতে দাও আগে।' এক ফেদাইন সঙ্গীদের বললো।

'এতো খুশী হয়ো না। তাঁর দেহরক্ষীরা পাশেই হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে।' অন্য ফেদাইন বললো।

'না, আশেপাশে কেউ নেই। আজকেই আঘাত করার মোক্ষম সময় এবং এখুনি। সাবধান, এমনভাবে তাকে আঘাত করতে হবে, যাতে কোনভাবেই সে বাঁচতে না পারে।' অন্য একজন বললো।

ফেদাইনদের দলনেতা একজনকে লক্ষ্য করে বললো, 'তুমি একাই আঘাত করার জন্য এগিয়ে যাও। আঘাত পিছন থেকে করবে। প্রয়োজন হলেই আমরা সামনে যাবো।'

লোকটি গুপ্তস্থান থেকে রওনা হওয়ার আগেই সুলতান আইয়ুবী টিলা থেকে নেমে এলেন এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে অন্যদিকে রওনা দিলেন। বাধ্য হয়ে ফেদাইনরা আবার তাঁর পিছু নিল। তারা একবারই সুলতানকে আক্রমণ করতে চায় এবং সে আক্রমণে সফল হতে চায়। এ রকম আক্রমণের জন্য চাই উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ। কিন্তু সুলতান রওনা হয়ে যাওয়ায় তৈরী হওয়া পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল।

আন নাসের এখনও সুলতান আইয়ুবীর দৃষ্টিসীমা থেকে বহু দূরে। সুলতান আইয়ুবী কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আরও একবার ঘোড়া থেকে নামলেন। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আবার অন্য

এক পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন। একটু পর সেখান থেকেও নেমে এলেন তিনি।

ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে চলতে শুরু করলেন আইয়ুবী। ফেদাইনরা সামান্য দূর থেকে লুকিয়ে দেখছিল তার কার্যক্রম। সুলতান আইয়ুবী এক স্থানে এসে থেমে গেলেন।

তারপর ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন জায়গাটি। এটি পাহাড়বেষ্টিত একটি মাঠ। মাঠের সবদিকেই পাহাড়, কোথাও একটু বেশী উঁচু, কোথাও কম।

তিনি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পিছনে কারো দৌড়ানোর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। এক ফেদাইন খুনী লম্বা খঞ্জর হাতে ছুটে আসছিল তার দিকে।

সুলতান আইয়ুবীর বুঝতে বাকী রইলো না, কি ঘটতে-যাচ্ছে। চকিতে তিনি তাঁর খঞ্জর বের করে নিলেন। ফেদাইন খুনী তাঁকে আঘাত করলো। সুলতান আইয়ুবী সে আঘাত নিজের খঞ্জর দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। আক্রমণকারী ছিল পাকা খুনী, স্বাস্থ্যবান এবং যথেষ্ট শক্তিশালী। সে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করলো আইয়ুবীর ওপর। সুলতান সে আক্রমণ ফিরিয়ে দিয়ে পাল্টা আঘাত হানলেন, কিন্তু তাকে ধরাশায়ী করতে পারলেন না।

এবার গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলো আরেক ফেদাইন। সেও সুলতানকে আক্রমণ করলো। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে উভয়ের আক্রমণ প্রতিহত করে চললেন।

অবস্থার জটিলতা উপলব্ধি করে আরো এক খুনী বেরিয়ে

এলো। সুলতান অবস্থা বেগতিক দেখে ঘোড়ার আড়ালে আশ্রয় নিলেন।

এক ফেদাইন ঘুরে তাঁকে আবার আক্রমণ করতে গেল, কিন্তু সুলতান তার মুখে এমন জোরে বাম হাতে ঘুষি মারলেন যে, সে পিছন দিকে উল্টে পড়ে গেল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিলেন। খঞ্জরটি বের করার সময় তিনি এমনভাবে টান দিলেন, লোকটির বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। মারা গেল সে ফেদাইন খুনী।

আরেক ফেদাইন দ্রুত ছুটে এসে পিছন থেকে সুলতানকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সুলতান চটজলদি সরে পড়ে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

ফেদাইন খুনীর খঞ্জর সুলতানকে বিদ্ধ করলো না বটে, কিন্তু খঞ্জরের মাথা সুলতানের বাহু ছুঁয়ে গেল। এতে আহত হয়ে পড়লেন সুলতান। কিন্তু আঘাত কতটা গভীর তা দেখার সময় ছিল না, অন্য দুই ফেদাইনও সামনে এসে পড়েছিল সুলতানকে আঘাত করার জন্য। এ সময়ই তীর বেগে ছুটে আসা ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেলেন সুলতান। অশ্বারোহী বন্ধু না শত্রু সেদিকে নজর দেয়ার ফুসরত পেলেন না সুলতান, দুই খুনী একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

মুহূর্তে একদিকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন সুলতান, অশ্বারোহী ঝাঁপিয়ে পড়লো খুনীদের ওপর।

এই অনাকাঙ্খিত আক্রমণে ভড়কে গেল খুনীরা, একজন পালাতে গিয়ে ঘোড়ার পায়ের তলে পিষে মারা পড়লো। বাকী

ফেদাইনটিকে ধরে ফেললেন সুলতান আইয়ুবী।

যুদ্ধ শেষ। এবারও অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন সুলতান আইয়ুবী। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা এভাবেই রক্ষা করেন।

যখন সুলতানের ওপর আক্রমণ শুরু হয়, তাঁর দেহরক্ষীরা দূরে এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে পায়। কারণ তারা দূর থেকেও সুলতানের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। তাদের এই সতর্কতা বৃথা যায়নি, আল্লাহ এই সতর্কতার উত্তম পুরস্কার দান করেন, বাঁচিয়ে দেন সুলতান আইয়ুবীকে।

এই ঘটনা ১১৭৬ সালের মে মাস তথা ৫৭১ হিজরীর জিলকদ মাসে ঘটেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার ডাইরীতে লিখেছেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এজাজ দুর্গ আক্রমণের জন্য যাওয়ার পথে তাঁকে একা পেয়ে ফেদাইন খুনীরা তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তাঁকে বাঁচিয়ে দেন।

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আকবার খান অবশ্য তার বইতে বহু উদ্ধৃতি টেনে ঘটনার কিছুটা ভিন্ন রকম বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, সুলতান আইয়ুবী এজাজ দুর্গ অবরোধের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথে বিশ্রামের সময় তিনি এক তাঁবুতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় গুপ্তঘাতক ফেদাইন চক্র তার ওপর হামলা চালায়। কিন্তু তিনি ফেদাইনদের খঞ্জরের আঘাত ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হন।

যুদ্ধ ও সফরের সময় তিনি এক রকমের শক্ত পাগড়ী ব্যবহার

করতেন। আক্রমণকারীর খঞ্জর তাঁর বাহুতে নয়, ওই পাগড়ীতে আঘাত করেছিল। সুলতান আইয়ুবী যখন এ আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন তখন তাঁর দেহরক্ষীরা এসে তাদেরকে হত্যা করে।

কিন্তু জেনারেল আকবর খানের চাইতে বাহাউদ্দিন শাদ্দাতের বর্ণনাই অধিক সঠিক বলে মনে হয়।

যে ফেদাইন ধরা পড়েছিল, সে স্বীকার করে বলল, 'আমরা চারজন আছিয়াত দুর্গ থেকে এসেছি।'

প্রাথমিক জবানবন্দীর পর তাকে হাসান বিন আবদুল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হলো। তিনি বন্দীর কাছ থেকে আছিয়াত দুর্গ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন। দুর্গে কতজন সৈন্য আছে, তাদের যুদ্ধ করার যোগ্যতা কেমন, অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে, সব স্বীকার করতে বাধ্য হলো লোকটি। অনুসন্ধানপর্ব শেষ হলে হাসান বিন আবদুল্লাহ সমস্ত রিপোর্ট সুলতান আইয়ুবীকে অবহিত করলো।

'আগামী কাল রাতের শেষ প্রহরে আমরা আছিয়াত দুর্গের পথে অভিযান চালাবো।' সুলতান আইয়ুবী তাঁর সেনাপতিদের একত্রিত করে বললেন, 'ফেদাইনদের আড্ডাখানা ধ্বংস করা জরুরী হয়ে পড়েছে সবার আগে।'

তিনি সেনাপতিদেরকে অভিযানের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

সেই সন্ধ্যায় প্রথমে হাসান বিন আবদুল্লাহর নজরে পড়লো একটি ক্লান্ত ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে দুই আরোহী। সন্ধ্যার

লালিমায় দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল শুধু ওদের কালো অবয়ব। ওদের গতি তুর্কমানের দিকে। একটু দূর দিয়ে ওরা ওদের পাশ কেটে এগিয়ে যাবে।

হাসান বিন আবদুল্লাহ ওদের গতি রোধ করার জন্য দু'জন কমাণ্ডোকে পাঠিয়ে দিলেন ওদের পথে। কমাণ্ডোদের কাছাকাছি চলে এলো ওরা। একদম সামনাসামনি হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। মুখোমুখি হতে প্রথমে আন নাসেরই চিনলো ওদের, একই বাহিনীর লোক ওরা। ওরাও চিনতে পারলো, আরে! এ যে আমাদের হারিয়ে যাওয়া আন নাসের!

অনেকদিন পর তিন বন্ধু একত্রিত হলো। চিনতে পেরেই একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে! কেমন আছো তুমি। সঙ্গের এ মেয়েটিই বা কে?'

আন নাসের এসব কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। বললো, 'সবই পরে বলবো, আগে বলো সুলতান কোথায়? আমাকে জলদি সুলতানের কাছে নিয়ে চলো।'

সুলতান নয়, ওরা ওকে নিয়ে গেল হাসান বিন আবদুল্লাহর কাছে। আন নাসের ওখানে পৌঁছেই হাসান বিন আবদুল্লাহকে দেখে বলে উঠলো, 'আমাকে জলদি সুলতানের কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর জীবন বিপন্ন।'

'শান্ত হয়ে বসো। আমাকে সব খুলে বলো। বলো এতদিন কোথায় ছিলে?'

লিজাকে পাশের রুমে সরিয়ে দিয়ে আন নাসেরকে নিয়ে

একান্তে বসলো হাসান বিন আবদুল্লাহ। আন নাসের সব ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বললো। আন নাসেরের কাছ থেকে সব রিপোর্ট জেনে নিয়ে হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'তোমাকে সুলতান আইয়ুবীর সাথে দেখা করাতে হবে।'

বিধ্বস্ত আন নাসের এবং লিজাকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো। একটানা পথচলা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সে তখন অর্ধমৃত অবস্থায়। লিজার অবস্থা আরও করুণ। তার চেহারা তোবড়ানো ফুলের মতো বিবর্ণ।

আন নাসের তাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে সে বিবরণ সুলতানকে শোনালো। কোন কথাই গোপন করলো না সে। লিজা সম্পর্কেও সব কথা সুলতানকে অকপটে খুলে বললো।

সুলতান আইয়ুবী লিজাকে বললেন, 'এবার তুমি তোমার কথা বলো। কোন রকম ভয় ও সঙ্কোচ ছাড়াই তুমি সব কথা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারো।'

লিজা নিজেকে একজন অসহায় বন্দীনি ভেবে চুপচাপ বসেছিল আন নাসেরের পাশে। ভাবছিল, আন নাসের তার সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছে, তাতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে তার ভাগ্যে। কিন্তু সুলতান তাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়ায় বিস্মিত ও অভিভুত হয়ে পড়লো। সেও সব কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে বললো, 'আল্লাহর কসম, আমি এখন আর খৃস্টান নই। আমার অতীত অপরাধের জন্য আপনি যে শাস্তি নির্ধারণ করবেন, আমি খুশী মনেই তা মাথা পেতে নেবো। তবে যদি মরতে হয়, আমি একজন মুসলমান হিসাবে

মরতে চাই।'

সুলতান বললেন, 'মরার কথা ভাবছো কেন মেয়ে? আল্লাহ তার অপরাধী বান্দাদের জন্য তওবার দুয়ার খোলা রেখেছেন। আমার এ অধিকার নেই, তোমাকে সত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেই। তুমি মুসলমান হিসাবেই জীবন যাপন করবে। এখন বলো, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'তাহলে আমাকে আন নাসেরের সাথে থাকার অনুমতি দিন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি তার আশ্রয়েই থাকতে চাই।'

'এ মুহূর্তেই তোমাকে এমন অনুমতি আমি দিতে পারি না। এখন তুমি একটি ঘোরের মধ্যে আছো। তোমাকে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর কাছে খুব সুখে এবং নিরাপদেই থাকবে তুমি। আন নাসের কিছুদিন পর তোমার সাথে দেখা করবে। তখন তোমার আবেগ ও ইচ্ছা তার কাছে ব্যক্ত করো। তারপর আমরা ভেবে দেখবো, তোমাকে আন নাসেরের আশ্রয়ে দেয়া যায় কিনা!'

ওখান থেকেই লিজা ও আন নাসেরকে আলাদা করে দেয়া হলো। পরদিন দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হলো লিজাকে আর আন নাসেরকে সুচিকিৎসার জন্য পাঠানো হলো ডাক্তারের কাছে।

দামেশকে লিজার নিরাপত্তা ও আরাম আয়েশে কোন সমস্যা না হলেও অন্তরে তার শান্তি ছিল না। সেখানে তার প্রতিটি প্রহর কাটতে লাগলো আন নাসেরের অপেক্ষায়। কিন্তু লিজাকে নিয়ে ভাববার মত অবসর আন নাসেরের ছিল না, সে তখন সুলতান

আইয়ুবীর অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে ছুটছে আছিয়াত কেল্লার দিকে। পেছনে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বিশাল বাহিনী। তাদের টার্গেট ফেদাইন খুনীচক্রের শক্তিশালী আস্তানা আছিয়াত কেল্লা, এজাজ দুর্গ এবং খৃষ্টানদের দোসর গাদ্দার মুসলমানদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলব শহর।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৯

খুনীচক্রের আস্তানায়

ক্রুসেড-১৮
বিভ্রান্ত ছোবল
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন